সেই মিথ্যাচার
আজও চলছে
রবীন দেব
এন. বি. এ.
১০.০০

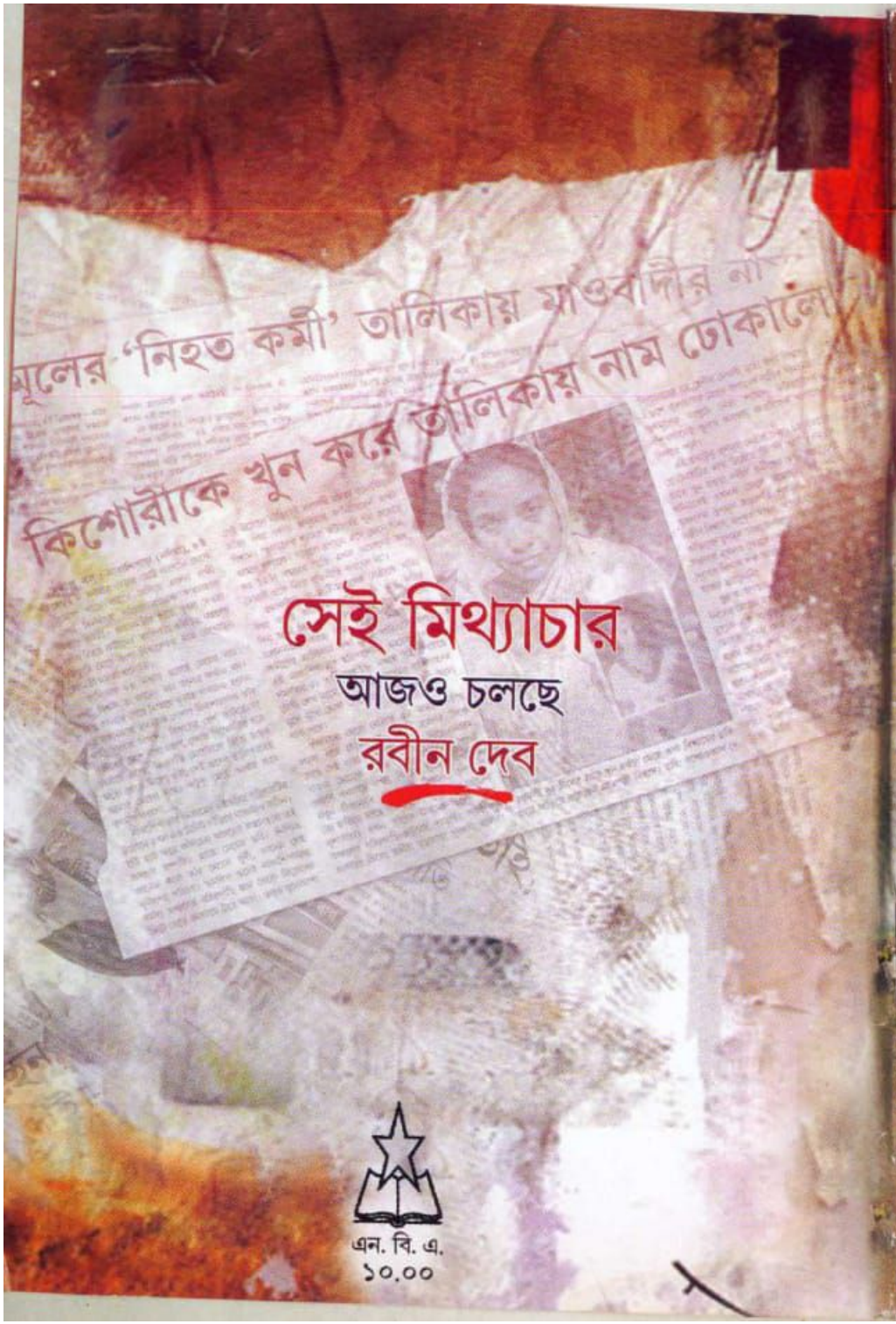

সেই মিথ্যাচার
আজও চলছে
রবীন দেব

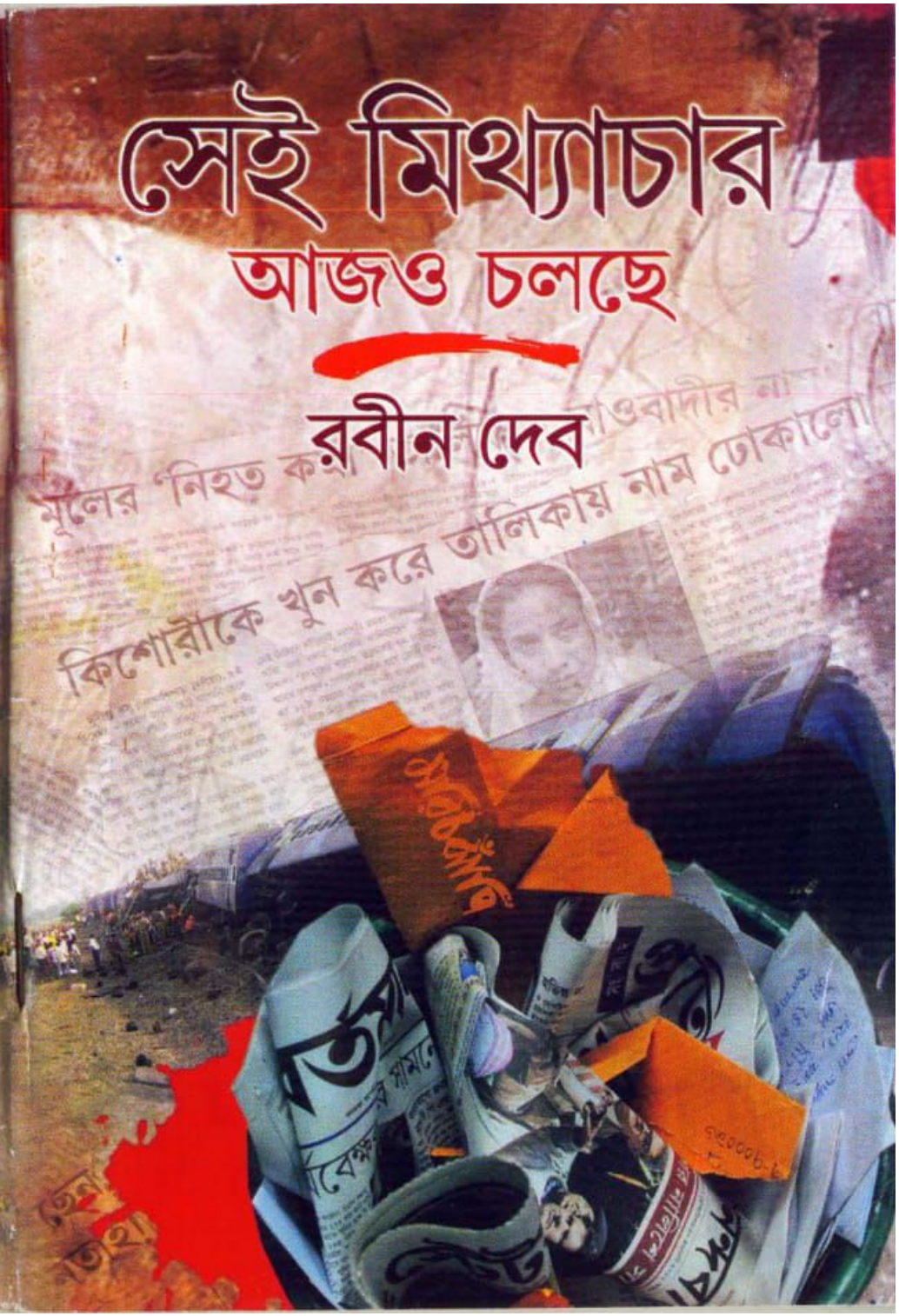

সেই মিথ্যাচার আজও চলছে

রবীন দেব

এন বি এ
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ
মার্চ, ২০১১
দ্বিতীয় মুদ্রণ
মার্চ ২০১১ (সুলভ সংস্করণ)

প্রকাশক
অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২এ, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
সুকান্ত মুখোপাধ্যায়
গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিমিটেড
৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

প্রচ্ছদ
মৃণালকান্তি দাস

মূল্য : ১০ টাকা

মিথ্যাচারের বুকে হানো আঘাত

সেই 'ট্রাডিশন' সমানে চলছে। দুনিয়ার সমাজ পরিবর্তনের দিশারী বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতবাদ আবিষ্কৃত হওয়ার জন্মলগ্ন থেকেই শুরু হয়েছে তার বিরুদ্ধে কুৎসা, অপবাদ এবং মিথ্যাচার। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতবাদকে নস্যাৎ করতে শাসকশ্রেণি এবং তার ধারকবাহক পত্রপত্রিকা, প্রচারমাধ্যম ও কিছু উচ্ছিষ্টভোজী লাগাতার বিরোধিতা করেছে। এ বিষয়ে তাদের অবলম্বন হয়েছে কখনও সরাসরি আক্রমণ, কখনও বিভ্রান্তি, অর্ধসত্য, বিকৃত তথ্য তুলে ধরা, কখনও বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও আদর্শের প্রতি বিশ্বাসে চিড় ধরাতে অনবরত মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া।

সমাজ পরিবর্তনের ধারায় যখন থেকেই শোষক-শোষিতের উৎপত্তি তখন থেকেই শাসক গোষ্ঠী একদিকে রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিপীড়নের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে আর তার সাথে শোষিত অংশের ঐক্য ও সঙ্ঘবদ্ধতা নষ্ট করতে চালিয়েছে বহুমুখী আক্রমণ। দাস সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ধারকবাহকরা এইভাবেই তাদের শোষণ-নিপীড়নকে অব্যাহত রেখেছে। বিপরীতে এসব ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর শক্তিও বিকশিত হয়েছে এই আক্রমণকে মোকাবিলা করেই। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পূর্বেকার পরিবর্তনগুলি ছিল—এক শোষণ ব্যবস্থার জায়গায় আর এক শোষণ ব্যবস্থা কায়েম করা। তবে দাস সমাজের পরিবর্তে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল প্রগতিশীল, তেমনি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হল তুলনামূলকভাবে প্রগতিশীল। পুঁজিবাদের পতনের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল। এমন একটি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা—যা আগেকার ব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটন করেছে এবং এই ব্যবস্থা শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে বেশিরভাগ মানুষকে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। মানুষের হাতে মানুষের শোষণ বন্ধের বজ্রনির্ঘোষে দৃপ্ত ছিল এই পরিবর্তন। দুনিয়াটাকে

বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই ১৮৪৮ সালে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস শোষণ ব্যবস্থা বদলের দর্শনকে কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন। পৃথিবীতে এই মতবাদ জন্ম নেওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে—শাসকশ্রেণী এবং ভাববাদী দার্শনিকদের পক্ষ থেকে নানা ধারায় আক্রমণ। কখনও বলা হয়েছে—মার্কস এঙ্গেলসের এই মতবাদ অচল, অবাস্তব। আবার কেউ কেউ একে পাগলের প্রলাপ বলতেও ছাড়েনি। ১৮৭১ সালে প্যারি কমিউন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমাজ পরিবর্তনে শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বের বিরুদ্ধে আক্রমণের ধারা ছিল তুঙ্গে। প্যারিসে মার্কস এঙ্গেলসের তত্ত্বের ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের কাজে প্রথম সাফল্য অর্জনে থমকে দাঁড়ায় এর শত্রুরা—এই তত্ত্বের বিরোধিতায় লিপ্ত স্থিতাবস্থার ধারকবাহকেরা।

কিন্তু ৭১ দিনের প্যারি কমিউনের পতনের সাথে সাথে ভাববাদী দার্শনিক এবং প্রগতির শত্রুরা আবার নতুন করে বহুধারায় বৈজ্ঞানিক মতবাদকে 'অসাড়' প্রমাণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যদিকে, মার্কসবাদীরা প্যারির পতনের কারণ খুঁজে তা দূর করতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর বিপরীতে মার্কসবাদের শত্রুরা এই মতবাদটাই অচল তা প্রমাণ করতে মরিয়া চেষ্টায় লিপ্ত হয়। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের সাফল্য ছিনিয়ে আনা পর্যন্ত দুনিয়ায় মার্কসবাদের সাফল্য অর্জন কোনো সহজ সরল রাস্তায় ঘটেনি। অনেক আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে অনেক বাঁক মোড় অতিক্রম করে, শত্রুর হিংস্র আক্রমণ কুৎসা অপবাদ ভেদ করেই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে রাশিয়ায় সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পত্তন লগ্ন থেকেই এর বিরুদ্ধে দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী শক্তির ষড়যন্ত্র শুরু হয়। বৈজ্ঞানিক মতবাদকে দৃঢ়তার সঙ্গে আগলে রেখে এই মতবাদের পক্ষে সোভিয়েতের জনগণের ব্যাপক অংশকে জড়ো করেই লেনিন-স্তালিনের নেতৃত্বে শত্রুর আক্রমণকে মোকাবিলা করে প্রথমে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি একটার পর একটা বিজয় অর্জন করেছে। সমাজব্যবস্থার ভিত্তি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে সামন্ততান্ত্রিক-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বুক চিরে নতুন নতুন সাফল্য ছিনিয়ে এনেছে মানব উন্নয়ন থেকে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, খেলার মাঠ থেকে মহাকাশ

সর্বত্রই উড়িয়েছে বিজয়কেতন। জয় করেছে সোভিয়েতের জনগণের ব্যাপক অংশকে আর প্রভাবিত করেছে দুনিয়ার দেশে দেশে পরিচালিত মুক্তি আন্দোলনকে।

সমাজতন্ত্রের শত্রুরা সোভিয়েতের অগ্রগতিকে নস্যাৎ করতে সবরকমের চেষ্টা চালিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী দেশের প্রচারমাধ্যমগুলি নতুন ব্যবস্থার ইতিবাচক দিকগুলিকে ঢাকতে বিরামহীন কসরত করেছে। কিন্তু এসব অপপ্রচার ও কুৎসা ভেদ করেই সমাজতন্ত্র তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় এগিয়েছে নির্দিষ্ট ধারায়। শত্রুরা চেষ্টা করেছে মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট মানুষকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে—চেষ্টা করেছে ভয় দেখিয়ে—নিপীড়নের বীভৎসতায়-মিথ্যাচারের বন্যায়। এসব প্রচারে কিন্তু মানুষ কিছুদিনের জন্য বিভ্রান্তও হয়েছেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে বিভ্রান্ত মানুষ সঠিক রাস্তা খুঁজে নিয়েছেন।

বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে রোধ করতে সমাজের বেশিরভাগ মানুষের শত্রুদের ঘৃণ্য পথ গ্রহণের অনেক উদাহরণ সমাজ বিকাশের প্রতিটি ধারায় মানুষ প্রত্যক্ষ করেছেন। মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থরক্ষায় সংখ্যাগরিষ্ঠকে বিভ্রান্ত করতে কালে কালে যুগে যুগে শাসকশ্রেণী একদিকে হিংস্রতা বর্বরতার আশ্রয় নিয়েছে—অন্যদিকে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে ছুঁড়ে দিয়েছে মিথ্যাচার-অপবাদ-প্রতারণা-প্রবঞ্চনার ডালি। এ বিষয়ে প্রচারমাধ্যমগুলিও শ্রেণিস্বার্থের উর্ধ্বে কোনো আচরণ করেনি।

মানুষকে বিভ্রান্ত করতে, শোষণ ব্যবস্থাকে কায়েম রাখতে মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের শীর্ষে স্থান করে নিয়েছিল—জার্মানিতে রাইখস্টাগ বা সংসদ পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা। কমিউনিস্টদের মানুষের আন্দোলন-সংগ্রাম থেকে নিপীড়ন কিংবা অত্যাচার দিয়ে বিচ্ছিন্ন করতে ব্যর্থ হয়ে নিজেরাই রাইখস্টাগ পুড়িয়ে জনগণকে ক্ষিপ্ত করতে অভিযোগ দায়ের করেছে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে। প্রচারের তোড়ে কিছু মানুষ বিভ্রান্তও হয়েছেন কিছু সময়ের জন্য। এই সুযোগে শাসকশ্রেণী তাদের উদ্দেশ্য পুরো মাত্রায় চরিতার্থ করেছে। জনগণের মিত্রকে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে চালিয়েছে আক্রমণের স্টিম রোলার।

আমাদের দেশেও ব্রিটিশ আমল থেকেই বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের সংগঠকদের উপর কখনও সরাসরি আক্রমণ চালানো হয়েছে—খুন করা হয়েছে—নির্যাতন করা হয়েছে, মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে। আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে চালানো হয়েছে মতবাদের বিরুদ্ধে কুৎসা অপবাদ। মীরাট, কানপুর-এর ষড়যন্ত্র মামলাগুলি এর উদাহরণ।

স্বাধীনতার পর দেশের শাসকগোষ্ঠী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অনুসৃত পথেই মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও মিথ্যাচারের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেও দেশের বুকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে মার্কসবাদীরা সংগ্রামের কর্মসূচীকে উপস্থিত করে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে জনজীবনের শত্রুকে চিহ্নিত করে বিভিন্ন ধারায় সংগ্রামকে অব্যাহত রাখেন। সাম্রাজ্যবাদ একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্তবাদের জোয়াল থেকে দেশকে মুক্ত করার অঙ্গীকার নিয়ে সংগ্রাম চলে। দেশের শাসকগোষ্ঠী বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতবাদ বিশ্লেষণকে সরাসরি আক্রমণ চালায়। কিন্তু মানুষ জীবনের অভিজ্ঞতায় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতবাদের প্রতি ক্রমশ আকৃষ্ট হতে থাকে। ফলে শাসকদল রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে এই মতবাদকে রুখতে। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-ছাত্র-যুব, মহিলাসহ বিভিন্ন স্তরের আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষের হৃদয়ে মার্কসবাদীরা ক্রমশ পৌঁছে যায়। মানুষ সমাজ পরিবর্তনের সাথী হিসাবে এই শক্তিকেই ধীরে ধীরে নির্ভরশীল মিত্র হিসাবে গ্রহণ করতে থাকে। শাসকগোষ্ঠী ক্ষিপ্ত হয়ে মার্কসবাদ তথা বৈজ্ঞানিক মতবাদকে 'বিদেশি' আখ্যার উগ্র জাতীয়তাবাদকে উসকে দিয়ে আক্রমণ চালায়। আন্দোলন ও সংগ্রামের সংগঠকদের উপর চলে নিপীড়ন, গ্রেপ্তার, মিথ্যা মামলা, তার সাথে পালা করে চলে কুৎসা অপবাদ। এসব সত্ত্বেও আমাদের দেশে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বামপন্থী শক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে। শাসক গোষ্ঠী এই শক্তির অভ্যন্তরে বিরোধ বাধাতেও তৎপর হয়। জুড়ে দেয় নানা ষড়যন্ত্রকারীদের। এতদ্‌সত্ত্বেও খেটেখাওয়া শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের মধ্যেই মানুষ ক্রমশ সামিল হন। দেশের স্বাধীনতার পর ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনেও এদেশে কমিউনিস্টরা অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র

প্রভৃতি রাজ্যে মানুষের আস্থা অর্জন করে। ১৯৫৭ সালে কেরলের নির্বাচনে কমিউনিস্টরা জয়ী হয়ে সরকারও গঠন করে। কংগ্রেস দল পরিচালিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির বিপরীতে ই এম এস নাম্বুদিরিপাদের নেতৃত্বে পরিচালিত কেরলের সরকারের অনুসৃত কর্মকাণ্ড দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আলোড়ন সৃষ্টি করে। কারা দেশের বেশিরভাগ মানুষের স্বার্থে সরকার চালান এবং কারা মুষ্টিমেয় অংশের স্বার্থে কাজ করে তা মানুষের সামনে স্পষ্ট হতে থাকে। কিন্তু কেরলের সেই কমিউনিস্ট সরকারকে বেশিদিন কাজ করতে দেওয়া হয়নি। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন সেই সময়ে কংগ্রেসের সভানেত্রী। ষড়যন্ত্র করে ১৯৫৯ সালে সরকারের পতন ঘটানো হয়। কিন্তু সরকার পতন ঘটানোর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনের ঝড় ওঠে। জনবিরোধী কংগ্রেস দলের স্বরূপ মানুষের সামনে উন্মোচিত হয়।

শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে দমন করতে কংগ্রেস দল ও কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রযন্ত্রকে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করে। কালাকানুন যথেচ্ছভাবে চালু করে। পুলিশ মিলিটারি চালায় আক্রমণ, তার সঙ্গে চলে ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনীর সন্ত্রাস এবং মিথ্যা মামলার মধ্যে দিয়ে এক ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতবাদকে মানুষের মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলা যায়নি। সমাজবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রেরণা সৃষ্টি করে দেশের গরিব মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের মনে। তাই 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ' 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ' ইত্যাদি ধ্বনিও ওঠে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে। শুরুতে সমাজতন্ত্র শব্দ উচ্চারণ করলেই তাকে দেশদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হত। তারপর সমাজবাদ শব্দ ব্যবহার করে সমাজবাদের প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের কৌশল গ্রহণ করে শাসকগোষ্ঠী। এই নতুন ষড়যন্ত্র মার্কসবাদী আদর্শ ও মতবাদের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ চালিয়ে ও বিদ্রূপ করেও এই মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট মানুষকে লড়াইয়ের ময়দান থেকে হটানো যাচ্ছে না। তাই 'কমিউনিজমের' নামে সমাজবাদের নামে, বামপন্থার নামে মূল মতবাদকে আক্রমণ করার পন্থা গ্রহণ করে দেশের শাসকদল। এদের এই কৌশলের ফাঁদে আদর্শ বিচ্যুত কিছু বিশ্বাসঘাতক ধরাও দেয়। কিন্তু দেশের ক্ষুদ্র

অংশের মধ্যে হলেও নীতির প্রতি অবিচল থেকে আদর্শের ভিত্তিতে সংগ্রামের দৃঢ়তায় মানুষ আরও বেশি সংখ্যায় সংগ্রামের ময়দানে সামিল হতে থাকে। এই সময়েই ১৯৬২ সালে চিন ভারত সীমানা বিরোধ দেখা দেয়। শাসকগোষ্ঠী সেই সুযোগে উগ্র জাতীয়তার ধুয়ো তুলে 'দেশদ্রোহী' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আন্তর্জাতিক মৈত্রী সৌভ্রাতৃত্বের ধারকবাহকদের উপর। যারা চিন-ভারত সীমানা বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা চেয়েছে তাদেরকে জেলে পুরেছে। মানুষের সামনে তুলে ধরেছে 'চিনের দালাল' ও 'দেশের শত্রু' হিসাবে। সেই সময় ভীত-সন্ত্রস্ত একাংশ শাসকশ্রেণির নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের প্রতি অবিচল থেকে আক্রমণ সত্ত্বেও দৃঢ়তার সঙ্গে নীতির প্রতি অবিচল থাকার শক্তিও দেশের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। শাসকগোষ্ঠীর এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের জালকে ভেদ করেই কমিউনিস্টরা এগিয়েছে, নতুন নতুন বিজয় অর্জন করেছে।

১৯৬৭ সালে 'দেশদ্রোহী' বলে চিহ্নিত মার্কসবাদীরা এই রাজ্যে এবং কেরলে কংগ্রেস দলের পরাজয় নিশ্চিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে ৯টি রাজ্যে কংগ্রেস দল পরাজিত হয়। কেরলে ও পশ্চিমবাংলায় কায়েম হয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। দু'টি রাজ্যেই সরকার পতন ঘটানো হয় ষড়যন্ত্র করে।

কিন্তু ১৯৬৯ সালের নির্বাচনে আরও বর্ধিত শক্তি নিয়েই জনগণের রায়ে পশ্চিমবাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৩ মাস পর এই সরকারেরও পতন হয়—ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে দিয়ে। ১৯৬৭ সালে ষড়যন্ত্রের নায়ক ছিলেন প্রফুল্ল ঘোষ এবং ১৯৭০ সালে ছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায়, সুশীল ধাড়া প্রমুখ।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে কমরেড জ্যোতি বসু লিখেছেন —

"দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানোর জন্য আমাদের বিরুদ্ধে যা নয় তাই বলা হয়েছে। পার্টির ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে আটকানোর জন্য আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা, মিথ্যা, ব্যক্তিগত চরিত্রহননের বেপরোয়া ন্যক্কারজনক প্রচার চালানো হয়েছে। বিভিন্ন বুর্জোয়া কাগজ ও অন্যান্য কমিউনিস্ট

বিরোধী শক্তিগুলি ভারতের 'কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)'র বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে উচ্চপর্যায়ে কুৎসার পরিবেশ তৈরি করেছে।"

১৯৫৯ সালে কেরলে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙা বা ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবাংলায় দু'টি যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানোর ক্ষেত্রে কারা ভূমিকা পালন করেছে—সে সম্পর্কে দু'টি বই থেকে উদ্ধৃতি এখানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

কেরল ও পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকার পতন ঘটানোর ক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কি ভূমিকা ছিল? Daniel Patrik Moinihan-এর 'A dangerous Place' পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃতি —

"We had twice but only twice, interfered in Indian politics to the extent of providing money to a political party. Both times this was done in the face of a prospective communist victory in a state election, once in Kerala and once in West Bengal, where Calcutta is located. Both times the money was given to the Congress Party, which had asked for it. Once it was given to Mrs. Gandhi herself, who was then a Party-official." (Page-41)

কেরালায় কমিউনিস্ট সরকারের পতনের পিছনে আমেরিকার ষড়যন্ত্র ছিল তার আরো অকাট্য প্রমাণ মেলে ১৯৫৬-৬১ সালে ভারতে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত এলসওয়ার্থ বাঙ্কারের জীবনী গ্রন্থে—সেখানে বলা হয়েছে—"...নির্বাচনী ফলাফল (কেরালায় কমিউনিস্ট পার্টির বিজয়) ওয়াশিংটনে বিপদঘন্টা বাজায়। এর ফলে কংগ্রেস দল ও অন্যান্য বিরোধী শক্তি আইন-শৃঙ্খলা অবনতির পরিকল্পনায় যে আন্দোলন করেছিল তাতে এজেন্সি টাকা ঢালে।"

এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে In Neheru's India-র বিবরণীতে আরো বলা হয়েছে, 'আরো কেরালা' যাতে না জন্ম নেয়, তার জন্যই এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। বাঙ্কার তার জীবনীকারকে জানিয়েছেন, 'তদানীন্তন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী এস কে পাতিলের মাধ্যমে কংগ্রেসকে এই টাকা দেওয়া হয়। (এলসওয়ার্থ বাঙ্কার : গ্লোবাল ট্রাবলশুটার ভিয়েতনাম হক)।

পশ্চিমবাংলায় যুক্তফ্রন্ট ভাঙার ক্ষেত্রে তদানীন্তন কংগ্রেসের ভূমিকা সম্পর্কে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষের লেখা 'কষ্টকল্পিত' থেকে উদ্ধৃতি—

"পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস ও কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার চক্রান্ত করে ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়াকে সমর্থন করেননি। এই ভাঙার ব্যাপারে প্রফুল্লদার (প্রফুল্লচন্দ্র সেন) সঙ্গে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরার যোগাযোগ ও সমর্থন ছিল। এর বিশদ বিবরণ অনেক সাংবাদিকের লেখায় বেরিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ ১৯৬৯ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। কংগ্রেস পায় মাত্র ৫৫টি আসন।"

('কষ্টকল্পিত'—অতুল্য ঘোষ, শেষ অনুচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ১৭৫)

এই রাজ্যে সি পি আই (এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের শক্তিকে খর্ব করতে দেশি বিদেশি প্রতিক্রিয়ার শক্তি সবসময়েই ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করেছে। এসব কাজে এরাজ্যের বহুল প্রচারিত আনন্দবাজার, যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকাগুলি নিরপেক্ষতার নামে শাসকশ্রেণির ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক মতবাদকে বিদেশি আখ্যা দিয়ে মানুষের কাছ থেকে মানুষের মিত্র শক্তিকে দুর্বল করতে না পেরে কুৎসা অপপ্রচারে বন্যা সৃষ্টিতে মরিয়া ভূমিকা পালন করেছে কংগ্রেস ও প্রতিক্রিয়ার শক্তি।

রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা, ১৯৬৯

১৬ই এপ্রিল ১৯৬৯ সালের আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপা হয়, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, লেক টেম্পল রোডের বাসিন্দা একজন মহিলার সাক্ষাৎকার। সেই সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ ছিল এই —

'আর্তচিৎকার, চারিদিকে টুকরো আগুন, ডায়াসের ওপর মারামারি—একদল মহিলার উপর একদল উশৃঙ্খল যুবককে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখলাম।'

এরপর থেকেই নিয়ম করে প্রকাশিত হতে থাকে 'গাড়ি ভর্তি অন্তর্বাস পাচার', 'গাড়ি ভর্তি লাশ পাচার' প্রভৃতি সংবাদ। স্বভাবজাত কারণেই

সেদিনও উঠেছিল রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি। এই দাবি যারা তুলেছিল তাদের লক্ষ্য ছিল যুক্তফ্রন্ট সরকার ও তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কমরেড জ্যোতি বসু। কারণ যুক্তফ্রন্ট, বিশেষ করে সি পি আই (এম)-র সঙ্গে তাদের শ্রেণীগত বিরোধ। আর এই বিরোধের জেরেই সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে দেখানোর জঘন্য ষড়যন্ত্র চলে।

আসলে রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনার তদন্তের জন্য জ্যোতি বসুই বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিচারপতি শম্ভুচরণ ঘোষের নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন রিপোর্ট দিলে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৯ সালে আনন্দবাজারকেও লিখতে বাধ্য হতে হল—'১৬ই এপ্রিল রবীন্দ্র সরোবরে নারী নিগ্রহ হয়নি।'

আলোকচিত্রী শ্রী শেখর তরফদারের তোলা প্রচুর ছবি ২৩ এপ্রিল ১৯৬৯ বসুমতীর পাতায় প্রকাশিত হয়। তিনিও বলেছিলেন মেয়েদের শ্লীলতাহানির কোনো ঘটনা ঘটেনি। মজার কথা হল এই যে, এত কিছু লেখার পরেও আনন্দবাজার-এর পক্ষে কেউ ঘোষ কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হননি। রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা নিয়ে কিছুদিন বাজার গরম করার পরেও পশ্চিমবঙ্গের সচেতন নাগরিকদের বিভ্রান্ত করা যায়নি। সমাজে কায়েমি স্বার্থের ধারকবাহক কংগ্রেস ও তাদের সমর্থক বাজারি পত্রপত্রিকাগুলিকে তখন খুঁজতে হয়েছে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অন্য রসদ। এর ঠিক পরের ধাপে সমগ্র ষড়যন্ত্র পরিচালিত হয়েছে বর্ধমানের সাঁইবাড়িকে কেন্দ্র করে।

সাঁইবাড়ি ষড়যন্ত্র, ১৯৭০

১৯৭০ সালের ১৬ই মার্চ ষড়যন্ত্র করে ভেঙে দেওয়া হয় দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। ১৭ই মার্চ এ রাজ্যে ঘটে যায় দুটি ঘটনা। এক, কেশোরাম রেয়ন কারখানায় পুলিশ, সি আর পি এফ এবং কারখানার নিরাপত্তা কর্মীদের গুলিতে নিহত হন সি পি আই (এম)-এর শাখা সম্পাদক কমরেড ননী দেবনাথ এবং ধর্মঘটী শ্রমিক তরুণ দুলে, রামজীবন, সুদর্শন সিং ও বীরেন সাহা। যদিও বাজারি সংবাদপত্রের পাতায় এই ঘটনা সম্পর্কে একটি কথাও লেখা হয়নি। ওদিনই বর্ধমানে চলছিল সি পি আই (এম)-এর ডাকা বন্‌ধ। আর ওই বন্‌ধের দিনে এক সংঘর্ষে প্রণব সাঁই এবং মলয় সাঁই মারা যান।

কিন্তু প্রকৃত ঘটনাকে চাপা দিতে পরের মুহূর্ত থেকেই শুরু হয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে কুৎসা। আসরে নামেন তৎকালীন রাজ্যপাল শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান। তিনি সস্ত্রীক সাঁইবাড়িতে আসেন। সাঁইবাড়ির ঘটনা নিয়ে সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে কুৎসার বন্যা ছোটানো হয়। যে কুৎসা আজকে ৪০ বছর পরে আবারও শুরু হয়েছে। কুৎসার লক্ষ্য অবশ্যই সি পি আই (এম)-এর শীর্ষস্থানীয় নেতা এমনকি রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্যও। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার—যাঁরা সংবাদপত্রের পাতায় ৪০ বছর আগের ঘটনা নিয়ে হলুদ সাংবাদিকতায় লিপ্ত তাঁরা ২৪ পরগনার থার্ড অ্যাডিশনাল সেশন জাজের এজলাসে বিচার্য সেশন কেস নং ৫৭(১) অফ ১৯৭৪ সেশনস ট্রায়াল নং ৩ (৭) অফ ১৯৭৭ মামলায় অর্ডার নং-২১ তাং ৬·৫·৭৮ পড়ে নিলেই দেখতে পাবেন যে আদালতই মামলায় সমস্ত অভিযুক্তদের খালাস করে দিয়েছেন। আসলে সাঁইবাড়ি ঘটনার পিছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল সি পি আই (এম)-এর শক্তঘাঁটি বর্ধমানে পার্টির শক্তিকে দুর্বল করা ও পার্টি নেতৃত্ব সম্পর্কে মানুষের কাছে ভুল বার্তা পাঠানো। সাময়িকভাবে তারা বর্ধমানে সে কাজে সফলও হয়েছিল। কংগ্রেসি নেতাদের চাপে পুলিশ এই মামলা নিজেদের মতো সাজিয়েছিল। ১৯৭০ সালের ৪ মে রাজ্যপালকে লেখা কমরেড জ্যোতি বসুর চিঠির কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। যাতে বসু উল্লেখ করেন কিভাবে কংগ্রেস তাদের নিজস্ব স্বার্থে প্রশাসনকে ও আদালতকে ব্যবহার করেছিল এবং গোটা বর্ধমান শহরে সন্ত্রাসের আবহ তৈরি করেছিল। এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের মূলে ছিল সি পি আই (এম)-কে 'খুনী' প্রমাণ করার অভিসন্ধি।

পাটনা স্টেশনে আক্রান্ত কমরেড জ্যোতি বসু, ১৯৭০

১৯৭০ সালের ৩১শে মার্চ পাটনায় জ্যোতি বসুকে হত্যার চেষ্টা হয়েছিল। এই আক্রমণ করেছিল আনন্দমার্গীরা। তাদের গুলিতে মারা যান আলি ইমাম নামে সি পি আই (এম) দরদী একজন জীবনবীমা কর্মী। যিনি পাটনা স্টেশনে জ্যোতিবাবুকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েছিলেন। সি পি আই (এম) পলিট ব্যুরো এই ঘটনাটিকে সাধারণ অপরাধ না বলে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিমূলক অপরাধ বলে মন্তব্য করে। এই ঘটনার দায়ও সেদিন চাপানোর চেষ্টা হয়েছিল

সি পি আই (এম)-এর উপর। দ্য স্টেটসম্যান এবং টাইমস অব ইন্ডিয়ার মতো সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল—'এই ঘটনার মূল দায় সি পি আই (এম)-এর, যারা গণজমায়েতের নামে দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে বিশৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। এই ঘটনার পরে ১২ই এপ্রিল ১৯৭০ সালে প্রকাশিত Peoples Democracy পত্রিকায় সি পি আই (এম) পলিট ব্যুরো সদস্য এম বাসবপুন্নাইয়ার লেখা 'Class Politics Behind the Murderous Attack on Jyoti Basu'-তে লেনিনকে উদ্ধৃত করে এম বি লেখেন "প্রত্যেকটা দেশেই বুর্জোয়া পত্রপত্রিকাগুলি খুব একটা চালু কৌশল অবলম্বন করে এবং তার ফলও পায়। পত্রিকাগুলি সমানে মিথ্যা কথা লেখে, চিৎকার চেঁচামেচি আর শোরগোল জুড়ে দেয়। কিছু না কিছু টিকে যাবে এই ভরসায় তারা লাগাতার মিথ্যার বেসাতি চালিয়ে যায়।" ভারতবর্ষের স্বাধীন সংবাদপত্রগুলির এই প্রচারের বেসাতি অতীতের রবীন্দ্র সরোবর থেকে সাঁইবাড়ি—সর্বক্ষেত্রেই প্রকট। মূল উদ্দেশ্য কমিউনিস্টদের ভাবমূর্তিকে জনমানসে ক্ষুণ্ণ করা।

নির্মল চ্যাটার্জি হত্যা : ১৯৭১

১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ ছিল সোনারপুরের এক দুঃস্বপ্নের রাত। রাত্রি আনুমানিক ১·৩০ মিনিট। সোনারপুরে সি পি আই (এম) শ্রমিক নেতা নির্মল চ্যাটার্জির বাড়ির কড়া নড়ে উঠল। বাইরে থেকে কিছু আগন্তুক জানালায় ধাক্কা দিতে দিতে বলে আমরা থানা থেকে আসছি—'ওসি এবং পুলিশ'। নির্মল চ্যাটার্জি এবং তার স্ত্রী গীতা চ্যাটার্জি দরজা খুলতে ৮-১০ জন ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে। নির্মল চ্যাটার্জিকে টানতে টানতে বার করে নিয়ে যায়। যুব কংগ্রেসি 'গণা' কিন্তু ঘরে থেকে যায়। তারপর গণা আর তার চ্যালারা চার সন্তানের জননীকে একটি ঘরে ঢোকায় ও ধর্ষণ করে। পরদিন সকালে নির্মল চ্যাটার্জির ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পাওয়া যায় সোনারপুরের রাস্তায়। ১৯৭২ সালের ১১ই মার্চ বোম্বাই থেকে প্রকাশিত ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলির পাতায় পাওয়া যাবে হুবহু উপরিউক্ত বর্ণনা অথচ কলকাতার বুকে বাজারি সংবাদপত্রের উচ্ছিষ্টভোগী কলমচিরা লিখলেন নির্মল চ্যাটার্জি কংগ্রেসি। মজার কথা হল তাতে সায় দিলেন স্বয়ং রাজ্যপাল। তদানীন্তন সাংসদ জ্যোতির্ময় বসুর পত্রের

উত্তরে রাজ্যপাল বলেছিলেন নির্মল চ্যাটার্জি কংগ্রেস কর্মী।

হেমন্ত বসু হত্যা, ১৯৭১

১৯৭১ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি জননেতা হেমন্ত বসুকে হত্যা করা হয়। বামপন্থীরা বলত, সাম্প্রতিককালে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন—তাৎপর্যপূর্ণভাবে দিনটা ৭ই জানুয়ারি ২০১০—"হেমন্ত বসুকে কারা হত্যা করল তা খুঁজে বার করবই"। আর ওইদিনই লালগড়ের নেতাই গ্রামে সাতজন গ্রামবাসীর মৃত্যুর ঘটনাকে হার্মাদদের গণহত্যা বলে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা করা হল। ৪০ বছর পর নির্বাচনের কয়েক মাস আগে সি পি আই (এম) বিরোধী অপপ্রচারকে জিইয়ে রাখতেই আবার ঘটনা ঘটানো হল। হেমন্ত বসু হত্যার পিছনে কারা ছিল? প্রকাশ্য দিবালোকে হেমন্ত বসুকে হত্যা করার পর ওই জমায়েতে স্লোগান ওঠে হেমন্ত বসুকে হত্যা করল কে? সি পি আই (এম) আবার কে?" দেওয়ালে লেপটে দেওয়া হল পোস্টার — 'তোমরা আমায় মারছ কেন?/আমি তোমাদের কি করেছি?/এই প্রশ্নের জবাব দিন/সি পি আই (এম)-কে কবর দিন'।

২০শে ফেব্রুয়ারি হেমন্ত বসু হত্যার পরে কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তের শোক বিবৃতিতে কটাক্ষ করে তৎকালীন কংগ্রেস নেতা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের বক্তব্য ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজারের প্রথম পাতায়। সিদ্ধার্থবাবু তাঁর বক্তব্যে সি পি আই (এম)-এর প্রতি বিষোদ্‌গার করতে গিয়ে মন্তব্য করেন—পিতাকে হত্যা করে পুত্রের মহা সমারোহে পিতার শ্রাদ্ধ করলে যেমন হয় শ্রী দাশগুপ্তের দুঃখপ্রকাশের বিবৃতিটাও সেরূপ। শ্রী রায় সি পি আই (এম) নেতার হরতাল ডাকার প্রস্তাবকে কুম্ভীরাশ্রু বলে বর্ণনা করেন। হেমন্ত বসু হত্যার পটভূমিতে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার। ১৯৭১ সালের ৩রা এপ্রিল ভারত সরকারের SIB তাঁদের C.4/C 71(18) নম্বরের এক অতি গোপন সার্কুলারে বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সি পি আই (এম)-এর নাম জড়িয়ে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। হেমন্ত বসু হত্যার কথা গত ৭ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে মমতা ব্যানার্জি বলে ভালোই করেছেন। এতে মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে সি পি আই (এম)-কে দোষারোপ করার পদ্ধতিটাও কোনো নতুন কিছু নয়। পূর্বে উল্লিখিত ময়নিহানের উক্তির কথা

স্মরণ করা যেতে পারে। তার বইতে লেখা পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে আমেরিকা টাকা ঢেলেছিল ১৯৭১ সালে। এবারে আসি এই মামলার তদন্তের প্রশ্নে—দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে এদের বিরুদ্ধে সন্দেহজনক কিছু না পাওয়ায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কমিউনিস্ট বিরোধী বাজারি সংবাদপত্রের পাতায় এই ছেড়ে দেবার খবর প্রকাশিত হয়নি। এরপর তদন্তের প্রশ্নে কয়েক বছর টালবাহানার পর সিদ্ধার্থবাবু কয়েকজন নকশাল যুবককে এই খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিচারার্থে চালান দেন। কিন্তু পুলিশ এমন কায়দা করে এই মামলাটি সাজালো যে সেটি শেষ পর্যন্ত ফেঁসে গেল। অভিযুক্তরা বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ঘোষণা করলেন যে তারা হাইকোর্টে আপিল করবেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা ভাল যে মামলার বিচার চলাকালে একজন অভিযুক্ত পক্ষের কৌঁসুলি আদালত কক্ষে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করেছিলেন যে উত্তর কলকাতার জনৈক প্রভাবশালী এক কংগ্রেস নেতার হাত ছিল এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের পিছনে। প্রাক্তন এক ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা যিনি দুর্নীতির দায়ে দল থেকে বহিষ্কৃত হন তিনিও জড়িত ছিলেন এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল হেমন্ত বসু ওই নেতার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক দুর্নীতির তদন্তের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

কাশীপুর-বরানগর গণহত্যা, ১৯৭১

নকশালপন্থী হঠকারীদের পত্রপত্রিকায় ভাল ছেলে আখ্যা দিয়ে তাদের দিয়ে খুন করা হয়েছিল সি পি আই (এম) কর্মীদের। পরে, সেই নকশালপন্থীদের একটা অংশকে ১৯৭১ সালের ১৩ই আগস্ট কাশীপুরে এবং পরবর্তীতে বরানগরে কচুকাটা করেছিল সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেসীরা। পরবর্তীকালে নকশালপন্থীদের একটা অংশ কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত 'কংশাল' নামে পরিচিত হয়। 'লাল ঝাণ্ডা'—তেরঙ্গা ঝাণ্ডা এক হয়ে আক্রমণ করেছে প্রকৃত বামপন্থীদের। কিন্তু তাতেও বামপন্থার অগ্রগতি রোধ করা যায়নি।

জরুরি অবস্থার কালো দিন, ১৯৭৫-৭৭

জরুরি অবস্থার কালো দিনগুলিতেও এই রাজ্যে আন্দোলন সংগ্রাম

বিকশিত হয়েছে এই অপবাদকে ভেদ করেই কংগ্রেস তখনও অতি বামপন্থীদের ব্যবহার করতে ছাড়েনি প্রকৃত আন্দোলনকে ঠেকাতে। তার একটা উদাহরণ উপস্থিত করছি বিশিষ্ট ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবী David Selbourne-এর লেখা দুনিয়ায় সাড়া জাগানো 'An Eye to India' বই থেকে :

Much more important to its purpose the NSS had reached a village and Major Das was on a tour of inspection—visibly hostile to his jeep's arrival. It's thread bare villages were living on the margin of survival—the walls of its village buildings were painted with CITU Zindabad. While its school was painted throughout with CPI(ML)'s hammer and sickle. 'What I said to Major Das "is the NSS doing here"? "Here' he said gesturing" the aim is to paint over these slogans, we told them that if you will not do it, we will wipe clean these slogans for you." And driving his jeep into the school compound and court-yard its interior walls covered also in red slogans, he said and if we can get the school master to us it is very good, because they have the young people." How I asked him Standing in the courtyard 'do you choose your villages for NSS Programme. We go' he said "mainly into CPI(M) and CPI(ML) areas. Through regular work in such areas, we can bring a change in the pattern of rural thinking. (Also it is difficult in this area. Here they are hostile. In religious areas, it is better. Where there are temples, there is less trouble, because there they feel more for other people." He told of villagers recent attacks on the NSS for ex-ample at a NSS Camp at Shriniketan, and said "We have to give them the feeling this is my village. This is my country and than we can stop the activity of the antisocial people.")

Some of the slogans were freshly painted, blood red, others long faded." Are they strong here? I asked. He shrugged "they are hiding way now" what will happen when they appear again?" We will do like we did before. To set CPI(ML) against CPI(M) is the best solution." (page 298-99)

হ্যাঁ উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে পরিষ্কার শাসকশ্রেণি শ্রমজীবী মানুষের

আন্দোলনকে ধ্বংস করতে প্রয়োজনে হঠকারীদের ব্যবহার করে কিভাবে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বামপন্থী আন্দোলনের অগ্রগতির ধারাকে ব্যাহত করতে কিছু সংখ্যক দলছুট নীতিভ্রষ্ট, বিচ্যুত, বহিষ্কৃত তথাকথিত বামপন্থীদের প্রচারের তোড়ে শাসকশ্রেণির স্বার্থরক্ষায় হাজির করা হচ্ছে সামনের সারিতে। আনন্দবাজারের মতো পত্রিকায় ওইসব বিকৃত বিচ্যুত, অধঃপতিত অংশকে তৃতীয় বিকল্পের সন্ধানে বলে হাজির করছে রঙিন মোড়কে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, এসব ঘৃণ্য কৌশল সম্পর্কে।

আমরা ভুলতে পারি না এই রাজ্যে আন্দোলন সংগ্রামের বিকাশকে ঠেকাতে কিভাবে বিভিন্ন সময়ে মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছিল শাসকশ্রেণি বিভিন্ন সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে। ১৯৭৭-এর বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে বাঁকুড়ার পাথরবন্দী গ্রাম পুড়িয়ে রটনা হয়েছিল সি পি আই (এম)-র বিরুদ্ধে বামফ্রন্টের জয় ঠেকাতে। পরে প্রমাণিত হয়েছে কংগ্রেসের ওই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র।

বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা ও মিথ্যাচার জন্মলগ্ন থেকেই

১৯৭৭ সালের ২১শে জুন দীর্ঘ সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ের পর পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসে শান্তি ও সুস্থিতি। প্রতিষ্ঠিত হয় কমরেড জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার। কিন্তু এই সরকারের জনমুখী নীতি এবং রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার সামগ্রিক প্রচেষ্টাকে বিকৃত করতে জন্মলগ্ন থেকেই ষড়যন্ত্রের জাল রচনা করে শাসকশ্রেণি। আর এই শাসকশ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলি—কংগ্রেস, জনতা পার্টি প্রভৃতি এই ষড়যন্ত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এই ষড়যন্ত্রে কাজে লাগানো হয় বাজারি সংবাদপত্র এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন গণমাধ্যমগুলিকেও। ১৯৭৭ পূর্বে এই বাংলায় যে ষড়যন্ত্রের জাল সৃষ্টি হয়েছিল সেই জালই আরও বিস্তৃত হল ৭৭ পরবর্তী সময়ে। গরিব মানুষের ক্ষমতায়ন এবং উন্নতি সহ্য করতে না পেরে এবং নিজেদের ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ভীত শাসকশ্রেণি এই ষড়যন্ত্রকে প্রতি মুহূর্তে শাণিত করেছে, শক্তিশালী করেছে। বামফ্রন্ট শাসিত পশ্চিমবঙ্গে এই ষড়যন্ত্রের প্রথম বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল ১৯৭৯ সালে, মরিচঝাঁপিতে।

মরিচঝাঁপি, ১৯৭৯

১৯৭৭ সালের ২১শে জুন রাজ্যে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৮ সাল নাগাদ মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশার দণ্ডকারণ্য থেকে অসংখ্য শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিলেন। বলা ভাল একদল কুচক্রী রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোনোরূপ আলোচনা ছাড়াই এই অসংখ্য মানুষকে ভুল বুঝিয়ে নিয়ে এসেছিলেন সুন্দরবনের কুমীরমারি অঞ্চলে। প্রথম থেকেই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ধৈর্যশীল উপায়ে প্রশাসনিকভাবে আলোচনার মাধ্যমে তাদের ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করে। বেশিরভাগ শরণার্থী ফিরেও যান। কিন্তু ৯-১০ হাজার শরণার্থী মরিচঝাঁপির মতো নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ঢুকে একটা সমান্তরাল প্রশাসন চালু করার চেষ্টা করে। ৩১শে জানুয়ারি মরিচঝাঁপিতে পুলিশ গুলি চালায়। ১লা ফেব্রুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়—"মরিচঝাঁপিতে গুলি : নিহত ৬, আহত ৫" প্রচার করা হতে থাকে 'আগুনে পুড়িয়ে, গুলি করে' শত শত নাকি হাজার মৃত, অর্ধমৃত উদ্বাস্তুর দেহ নিয়ে লঞ্চে করে ফেলে দেওয়া হয়েছিল গভীর জঙ্গলে। বাকি দেহ ফেলা হল গভীর সমুদ্রে, এইভাবেই মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তু শূন্য হল। সাম্প্রতিককালে নবীন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করতে এবং বামফ্রন্ট বিরোধী কুৎসাকে শক্ত করতে একশ্রেণির সংবাদমাধ্যম অতীতের ঘটে যাওয়া ঘটনাকে নিয়ে মিথ্যাচার করছে, সেইসময় দাঁড়িয়ে নবীন প্রজন্মের জানা দরকার যে মরিচঝাঁপিতে আসলে কজন মারা গিয়েছিলেন? মরিচঝাঁপির ঘটনা প্রসঙ্গে কমরেড জ্যোতি বসু বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ২ জনের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছিলেন। তাঁকে যারা চ্যালেঞ্জ করছিলেন তারা কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা বা মৃতের তালিকা দিতে পারেননি।

আনন্দমার্গী হত্যা, ১৯৮২

তৃণমূলী বিদ্বজ্জন থেকে শুরু করে এরাজ্যের বামবিরোধী রাজনৈতিক শক্তির অন্যতম কুৎসার সূত্র হল ১৯৮২ সালের ৩০শে এপ্রিল বালিগঞ্জের বিজন সেতুর উপর কয়েকজন আনন্দমার্গীর হত্যার ঘটনা। ১৯৮২ সালের বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯শে মে তারিখে। নির্বাচনের মাত্র

কয়েকদিন আগে এই হত্যার ঘটনার যাবতীয় দায় সি পি আই (এম)-এর উপর চাপাতে কুৎসা চালিয়েছিল কংগ্রেসসহ বাজারি সংবাদপত্রগুলি। আজও এত বছর পর কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর সেই ধারা অব্যাহত। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে নির্বাচনের পরে এটা প্রকাশিত হয়েছিল সি পি আই (এম) নয়, আনন্দমার্গীদের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণতিতেই ওই খুন হয়েছে।

প্রিয়দাসের চাবি

১৯৮৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর চিতাভস্ম সামনে রেখে হাওড়ায় কংগ্রেস প্রার্থী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী বন্ধ কারখানা খোলার চাবি দেখিয়েছিলেন। সমস্ত বন্ধ কারখানা খোলার চাবি দেখানো প্রিয়দাস জিতেছিলেন নির্বাচনে। ফল প্রকাশ হবার পর এই চাবির আর দেখা মেলেনি। ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে এই ভাঁওতার জবাব দেন হাওড়ার মানুষ। পরাজিত হন প্রিয়দাস।

আরো মিথ্যাচার, আরো কুৎসা, ১৯৮৪-৯০

১৯৮৪ সালের ১১ই মার্চ শিয়ালদহ অঞ্চলের লরেটো স্কুলের ছাত্রী মধুমিতা মিত্রের উপর আক্রমণ সংগঠিত হল। ১৯শে মার্চ তার মৃত্যু হল। আনন্দবাজারসহ বাজারি পত্রিকায় ওই খুনের জন্য এস এফ আই-কে অভিযুক্ত করার চেষ্টা হয়েছিল। ১৯৯০ সালের ১৯শে জুন আদালত রায় দিল মধুমিতা মিত্রকে খুন করেছে ছাত্র পরিষদ কর্মী মোহনলাল দাস (মনা)। ১৯৯০ সালের কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ৩০শে এপ্রিল বানতলায় এক দুঃখজনক ঘটনার জন্যও বামফ্রন্টকে দায়ী করে পত্রপত্রিকা হইচই শুরু করল। সেই সময়েই বাঁকুড়ার বি জে পি নেতা গুণময় চ্যাটার্জিকে সি পি আই (এম) খুন করেছে এরকম সংবাদ আনন্দবাজারে ছাপা হল। তারপর গুণময় চ্যাটার্জি নিজেই ফোন করে জানালেন তিনি বেঁচে আছেন।

৯০-এর ডিসেম্বরে বাঁকুড়ার কংগ্রেস (আই) নেতা কাশীনাথ মিশ্রের কন্যার শ্লীলতাহানির সংবাদ ফলাও করে প্রচার করা হল বামফ্রন্টের ভাবমূর্তি

কলুষিত করতে। কিন্তু একদিন পরেই কাশীনাথ মিশ্রই বিবৃতিতে জানালেন এই সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

বালিগঞ্জ উপনির্বাচন, ১৯৯২

৮ই জুন ১৯৯২ বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের দিন পরিকল্পিত উপায়ে গণ্ডগোল বাধিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জি। তখন এত ইলেকট্রনিক্স প্রচারমাধ্যমের দাপাদাপি বাড়েনি। এক ছিল দূরদর্শন। সেই দূরদর্শনের ক্যামেরাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করে একের পর এক হিংসাশ্রয়ী ঘটনায় মদত দিতে থাকেন বর্তমান তৃণমূল নেত্রী। ৭ জন পুলিশ আহত হয়। আর এই গোলমালের পরিণতিতেই গুলি চালাতে বাধ্য হয় পুলিশ। একজন যুবকের মৃত্যু হয়। ঘটনার তদন্তে রাজ্য সরকার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কে এম ইউসুফের নেতৃত্বে বিচার বিভাগীয় কমিশন বসায়। কমিশনের রিপোর্টেও বলা হয়—"কমিশন বুঝেছে যে, উপনির্বাচনের দিন ব্যাপক হাঙ্গামা সৃষ্টির সুপরিকল্পনাটি ভালোভাবেই তৈরি হয়েছিল এবং এই পরিকল্পনা হয়েছিল উপনির্বাচনের ২৪ ঘন্টা আগেই কসবার একটি স্থানে মমতা ব্যানার্জির তদারকি ও নির্দেশে।" কমিশনের রিপোর্টে আরো বলা হয় যে—"হাঙ্গামার পরিকল্পনা কুমারী ব্যানার্জির নির্দেশ ও পরিচালনায় রূপায়িত হয়েছিল। এই পরিকল্পনা কার্যকরের সময় কংগ্রেস (আই) সমর্থক ও কর্মীরা বহিরাগতদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলেই বিশৃঙ্খলা ও মারাত্মক ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। সেজন্য পুলিশ বাধ্য হয়েছিল গুলি চালনাসহ কয়েকটি জায়গায় কঠোর ব্যবস্থা নিতে।" প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে সেদিন মমতা ব্যানার্জির অনুগত কংগ্রেস কর্মীরা তাড়া করেছিল আজকের তৃণমূল নেতা সুব্রত মুখার্জিকে, কমিশনে সাক্ষী দিতে এসে বলেছিলেন তিনি, "আমি সেদিন খুন হয়ে যেতাম।"

'দীপালি বসাক ধর্ষণ' (!) ও 'মহাকরণ দখল অভিযান', ১৯৯৩

১৯৯৩ সালের ৭ই জানুয়ারি আরো একটি মিথ্যাচারের নজির গড়েছিলেন তৎকালীন যুব কংগ্রেসের নেত্রী আর আজকের তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা

ব্যানার্জি। তখন আবার তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। নদিয়ার একটি গ্রামে মাস চারেক আগে ধর্ষণের অভিযোগ সি পি আই (এম)-এর ঘাড়ে চাপানোর এতবড় টাটকা মওকাই বা আর তখন কোথায়? তাই ৭ই জানুয়ারি ধর্ষিতা কিশোরী দীপালি বসাক ও তার মা কল্যাণী বসাককে নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনোরকম পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী ছাড়াই চলে আসেন মহাকরণে। ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধে যায়। উত্তেজনা ছড়াতে থাকেন। শোনা যায় এক পুলিশের হাত তিনি কামড়েও দিয়েছিলেন। নেত্রীর প্রিয় সংবাদমাধ্যমগুলির প্রতিনিধিরাও এদিন রাইটার্সে সংরক্ষিত এলাকায় উন্মত্ত হিংসার সৃষ্টি করে। যা বাস্তবিক নজিরবিহীন। যাই হোক 'সি পি আই (এম) ধর্ষণ করেছে এই অভিযোগ পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর প্রিয় সাংবাদিককুল একটা কার্ড থেকে অন্য কার্ডে চলে গেছেন। প্রায় সকলের অজান্তেই দীপালি বসাক সেখানে একটা ছুতো মাত্র। ৮ই জানুয়ারি কংগ্রেসি বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতা কর্পোরেশনে কর্মীদের উপর হামলা হয়। আহত হন ৩৬ জন কর্মচারী। ৯ই জানুয়ারি কংগ্রেস নেতাদের উত্তেজক বক্তব্যে আবার উত্তেজনা। পুলিশের প্রিজন ভ্যান থেকে ধৃতকে ছিনিয়ে আনতে এমনকি ব্যাঙ্কশাল কোর্টেও ব্যাপক হামলা করে নেত্রীর আশ্রিত ভৈরববাহিনী। ওই বছরেরই ২১শে জুলাই নেত্রীর মহাকরণ অভিযান, অচিরেই পরিণত হল মহাকরণ দখল অভিযানে। পুলিশ বাধ্য হয় গুলি চালাতে। পুলিশের গুলিতে কয়েকজনের মৃত্যু হয়। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা হয় গোটা রাজ্যে। শুরু হয় সি পি আই (এম) বিরোধী মিথ্যাচারের নতুন বেসাতি। উত্তেজনায় নতুন মোড়ক দিতে নেত্রী আহত সেজে অভিনয় করছিলেন এস এস কে এম হাসপাতালে। সর্বভারতীয় দৈনিকগুলির প্রায় সবকটিই ওই দিন মমতা ব্যানার্জির এই সশস্ত্র হামলার ঘটনার নিন্দা করে।

উৎপল ভৌমিক হত্যা, ১৯৯৩

৯৩ সালের আগস্ট মাসে হাওড়ায় খুন হলেন কংগ্রেস নেতা উৎপল ভৌমিক ও দেবু ঘোষ। ঘটনায় ধরা পড়লেন আর কেউ নয়, খোদ যুব

কংগ্রেসের নেতা মমতা অনুগামী বিনোদানন্দ ব্যানার্জি। সোমেন মিত্র খোলাখুলি সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন—হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকায় পুলিশ গ্রেপ্তার করায় বিনোদানন্দকে বহিষ্কার করা হয়েছে। দুঃখের কথা—আজকে কিন্তু সোমেন মিত্র আর বিনোদানন্দ ব্যানার্জি একই দল করেন—মমতা ব্যানার্জির দল, তৃণমূল কংগ্রেস।

বেদীভবন কাণ্ড

২৫শে অক্টোবর, ১৯৯৮। "আমার জামা ছিঁড়ে দিয়েছে পুলিশের ডি সি (দক্ষিণ)। হাত কামড়ে দিয়েছে দুজন ও সি"—গুজব ছড়ালেন মমতা ব্যানার্জি। জমল না তাণ্ডব। সেলুলারে আবার উত্তেজনা। ঘটনার সূত্রপাত — গোলপার্কের বেদীভবনের জমি থেকে নাকি পুলিশ গরিব মানুষকে তুলে দিচ্ছে। আসরে হাজির মমতা ব্যানার্জি। হাইকোর্টের রায় হাতে নিয়ে রাজ্য পুলিশ গিয়েছিল বেদীভবন অধিগ্রহণ করতে। নেত্রী আক্রান্ত বলে চালানো হল গুজব। ঘটে গেল চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। দুটি বাস জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ট্রেন অবরোধ করা হয়। হামলা চলল হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্ধমান প্রভৃতি জায়গায়। আর এত আগুন জ্বালানোর পর তাকে পাওয়া গেল। তিনি তখন বেদীভবনের বিছানায় আধশোয়া।

সুজাতা দাস, ১৯৯৮

১৯৯৮ সালের ৯ই জানুয়ারি খুন হলেন সুজাতা দাস। তাঁকে হত্যা করে তৃণমূলেরই কর্মীরা। ১০ই জানুয়ারি ভোরে সি পি আই (এম) কর্মী শ্রীপতি দাসের বাড়ির কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় সুজাতার মৃতদেহ। ধর্ষণের কোনো চিহ্নও পাওয়া যায়নি মেডিকেল পরীক্ষায়। সুজাতাকে সি পি আই (এম) মেরেছে এই ঘটনার প্রামাণ্য কোনো কিছু দিতে পারেননি সুজাতার বাবা ও কোনো প্রত্যক্ষদর্শী। তবুও এই ঘটনার পর রাজনীতি করতে ছাড়েনি তৃণমূল। এই ঘটনার তদন্ত করতে দিল্লি থেকে এসেছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দুই সদস্য ওয়াই এন শ্রীবাস্তব এবং শিবাজী সিং। কিন্তু তাঁরা ঘটনাস্থলের দিকে এক পাও বাড়ায়নি। আসলে এটা ছিল সাজানো ঘটনা—সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে আরো একটা কুৎসা। তৃণমূলের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে এই মৃত্যু ঘটেছিল। উল্লেখ্য

বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিরোধী বিধায়কদের বলেছিলেন যে আসল ঘটনা প্রকাশিত হলে বিরোধীদের মুখ দেখানোই কঠিন হয়ে যাবে। পরবর্তীতে আদালত—তৃণমূল কর্মীদেরই এই খুনের দায়ে অভিযুক্ত করেন।

চম্পলা সর্দার, ১৯৯৮

চম্পলা সর্দার নামটা আর কোনো ছোট বড় তৃণমূল নেতানেত্রীর গলায় শোনা যায় না। কারণ চম্পলাকে ব্যবহার করার কাজ ফুরিয়ে গেছে তৃণমূল নেত্রীর। ভাঙরের অশ্বত্থবেড়িয়া গ্রামে আজও থাকেন চম্পলা সর্দার। ১৯৯৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী। এই অপরাধে নাকি ২১শে মে তারিখে পাঁচজন সি পি আই (এম) চম্পলার সম্ভ্রম হানি করেছে। ধর্ষণ করেছে। প্রচারমাধ্যমে তখন একটাই 'হেডলাইন' অথবা 'এক্সক্লুসিভ' সেটা চম্পলা সর্দার। কে বা কারা চম্পলাদের ছোট্ট ঘরে স্বামী সন্তানের সামনে থেকে চম্পলাকে তুলে নিয়ে যায়! এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি কেউই। পাঁচজন মিলে ধর্ষণ করার পরেও কেন চম্পলার শরীরে একটাও আঘাতের চিহ্ন খুঁজে পেল না চিকিৎসকরা? এ প্রশ্নেরও মেলেনি সদুত্তর। অথচ চম্পলা সর্দারকে ধর্ষণের দায়ে মিথ্যা মামলায় জেল খেটে এলেন মনোহর ঘরামি, ইভান মোল্লা, শ্রীনাথ ঘড়াই, উদয় মাণ্ডি এবং বিশ্বনাথ রুইদাস। ২৩শে মে চম্পলাকে গাড়ি করে অশ্বত্থবেড়িয়া থেকে গড়িয়াহাটের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন মমতা ব্যানার্জি। ২৫শে মে, '৯৮ রাজ্যজুড়ে ধর্মঘট ডাকা হয়। নার্সিংহোমে চম্পলাকে দেখতে আসেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ। একেই বলে সময়ের পরিণতি। নির্বাচন শেষ। পঞ্চায়েতে ধরাশায়ী তৃণমূল। পরাজিত খোদ চম্পলা সর্দার। 'মানবতার মূর্ত প্রতীক' মমতা ব্যানার্জি থেকে সংবাদপত্রের প্রতিনিধি কেউই সেদিন ছিল না গড়িয়াহাটের নার্সিংহোমে—যেদিন ছেলের হাত ধরে চম্পলা সর্দার কলকাতার রাস্তায়!

এরকম ঘটনা আরো আছে। সাতগাছিয়ার কেষ্ট ঘাটা ও হরিপদ মণ্ডলের বিরুদ্ধে বাবলু দলুইকে হত্যার অভিযোগ আনে তৃণমূল কংগ্রেস। মৃতর মা জানান তার ছেলে গলায় কইমাছ-এর কাঁটা আটকে মারা গেছে। পরে বিচারে অভিযুক্তরা বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। এভাবে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে

দুজন খেতমজুরকে জেল খাটাতেও লজ্জা হয়নি তৃণমূল কংগ্রেসের। আসলে দুনিয়া জুড়ে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামকে ভাঙতে শাসকশ্রেণী সাজানো মামলায় বারে বারে ফাঁসিয়েছে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের নেতৃত্বকে, নেতৃত্ব প্রদানকারী কমিউনিস্ট পার্টিকে।

বিকাশ বসু হত্যা, ২০০০

১লা এপ্রিল ২০০০ সাল। খুন হলেন উত্তর ২৪ পরগনার নোয়াপাড়ার তৃণমূল কাউন্সিলর বিকাশ বসু। পুরুলিয়ায় বসে মমতা ব্যানার্জি বললেন — "খুনের রাজনীতি করছে সি পি এম, আমরা এটা চাই না। সি পি আই (এম) যেভাবে আমাদের মারছে, তাতে বোঝা যায় ওরা উন্নয়ন চায় না। সেইজন্য আমি যখন উন্নয়নের জন্য কাজে এইখানে এসেছি, তখন সুপরিকল্পিতভাবে ওরা বিকাশকে খুন করল।" আর সি পি আই (এম) বিরোধী এই মিথ্যাচারও প্রমাণ হয়নি। বরং প্রমাণিত হয়েছে—তৃণমূল নেতার হত্যাকাণ্ডে দলেরই দুই সমর্থক ধৃত (৯ই এপ্রিল, আনন্দবাজার)—বিকাশ খুনে তৃণমূল নেতাসহ ধৃত সাতজন (৯ই এপ্রিল, বর্তমান)—গোয়েন্দা রিপোর্ট জানালো বিকাশ বসুর খুনীরা হলেন গোপাল, অর্জুন সিং প্রমুখ—যারা তৃণমূল নেতা ও কর্মী। ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে খুনের অভিযোগের আঙুল যার দিকে সেই অর্জুন সিং আর নিহতের স্ত্রী মঞ্জু বসুকে প্রার্থী করেন তৃণমূল নেত্রী।

গৌর খাঁড়ার জিহ্বা কাণ্ড, ২০০০

দাসপুরের ডিপলশা গ্রামের বাসিন্দা গৌর খাঁড়া। রাজনীতির সঙ্গে কোনো যোগাযোগই ছিল না। তবুও সি পি আই (এম)-এর সন্ত্রাস নিয়ে তৃণমূল আয়োজিত প্রদর্শনীতে তার ছবি স্থান পেয়েছিল। সেটা ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাস। কয়েকমাস পরের ১৩তম লোকসভা নির্বাচন। তৃণমূলী রাজনৈতিক মিথ্যাচারের তাস হয়েছিলেন এই মানুষটি। ২০০০ সালের ১২ই ডিসেম্বর ডিপলিশা গ্রামের তেমাথালি মোড়ের উদয় সংঘের ক্লাবঘরে ক্যারাম খেলছিল গৌর। ক্লাবের বাইরে দেওয়াল লেখা নিয়ে বচসায় আর পাঁচজনের মতো থামাতে গিয়েছিলেন তিনি। আঘাত লাগে। এরপর থেকেই মিডিয়ার

শিরোনামে গৌর খাঁড়া। মমতা ব্যানার্জি গৌরের ভাইকে বলেও এসেছিলেন, 'চিন্তা নেই, চাকরি দেবো'। বলা হয়েছিল গৌরের জিভ কেটে দিয়েছে সি পি আই (এম)। কি হয়েছিল শুনুন গৌরের নিজের মুখেই—'সি পি এম নয়। আমার জিভের চিকিৎসার জন্য তৃণমূল আমাকে কলকাতায় ডাঃ কাশেমের নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়েছিল। ওখানেই আমার জিভের খানিকটা কেটে দেওয়া হয়। তারপর দিল্লিতে গিয়ে বলা হয় সি পি এম আমার জিভ কেটে নিয়েছে। দিল্লিতে আমাকে চুপ থাকতে বলা হয়েছিল।" ডাঃ কাশেমের নার্সিংহোমে একজন তৃণমূল ডাক্তারকেও দেখেছিলেন তিনি। ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার। তৃণমূলী রাজনীতির কোপে জিভ খোয়ানো গৌর খাঁড়া আজও বেঁচে আছে। তবে সে বলে, "জিভ আর গোটা হবে না, কিন্তু তৃণমূল যে কি জিনিস বুঝে গেছি।"

কেশপুরের সন্ত্রাসের পরিকল্পনা, ২০০১

৩রা জানুয়ারি ২০০১ সালে কেশপুরের জনসভায় মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন—'কেশপুর-গড়বেতার মতো সি পি এম-এর শক্ত ঘাঁটি নিয়ে খেলা করাটা আমাদের রাজনৈতিক চাল। আমি খুশি যে সি পি এম কেশপুর-গড়বেতা নিয়ে সামাল দেবার কাজে ব্যস্ত থাক।' কেশপুরের ৩রা জানুয়ারির সভায় মমতা ব্যানার্জির স্বীকারোক্তি পরের দিন প্রকাশিত হয়েছিল বেশিরভাগ সংবাদপত্রে।

মমতার পায়ে চোট, ২০০১

৩রা জানুয়ারি ২০০১ কেশপুরে সি পি আই (এম)-এর আঘাতে আক্রান্ত হন মমতা ব্যানার্জি। এই প্রচারের স্বার্থেই বাংলা বন্‌ধেরও ডাক দিয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু প্রচারের আতিশয্যে যে কথাটা তৃণমূলী বান্ধব বাজারী সংবাদপত্রগুলি প্রচারের দুর্বলতাটা প্রকট করে দিল তা হল এই যে প্রতিটি কাগজেই রকমারি আঘাতের কথা লেখা হয়েছে।

মমতা ব্যানার্জির পায়ে চোট লাগার ঘটনা নিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য একটি মেডিকেল বোর্ড গড়ার প্রস্তাব দেন সি পি আই (এম)-এর তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস। দেখা যাক ঠিক আসলে কোথায় আঘাত

পেয়েছিলেন মমতা। ৪ঠা জানুয়ারির আনন্দবাজারে লেখা হয়, "খবর পেয়ে মমতা কেশপুর থেকে ন্যাড়াদেউলের দিকে এগোতেই সি পি এম সমর্থকদের হাতে ঘেরাও হয়ে পড়েন। তার কনভয়েও ইঁট ছোঁড়া হয়। মমতার পায়ে ইটের আঘাত লাগে।"

৪ঠা জানুয়ারি প্রতিদিন লেখে—"মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ঘটনা ঘটে এই মহিষদায়।...মমতা তখন ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে। সেসময়ই সি পি এম-এর ছোঁড়া একটা ইঁট সরাসরি মমতার পায়ে এসে লাগে। মুকুল রায়ের অভিযোগ, ওই ইটের ঘায়ে থেঁতলে গেছে মমতার পায়ের তিনটি আঙুল।

বর্তমানে লেখা হয় — "সন্ধে সাড়ে ছটা নাগাদ মহিষদায় মমতার দুশ গজ দূরে মুড়ি-মুড়কির মতো বোমা পড়ে। চারিদিকে ব্যাপক হারে গুলিও চালানো হয়। একটি ইঁট এসে তৃণমূল নেত্রীর পায়ে লাগায় তিনি জখম হন।"

টাইমস অব ইন্ডিয়া ৪ঠা জানুয়ারি লিখেছিল—কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র সুব্রত মুখার্জির বক্তব্য অনুযায়ী, সমাবেশের জায়গায় দূর থেকে ছোঁড়া একটি পাথর হঠাৎ আঘাত করায় মমতা ব্যানার্জি নিজেও পায়ের পাতায় চোট পেয়েছেন।

আবার ওই একই পত্রিকায় ৫ তারিখ বেরোল—উনি কেশপুরে আঘাত পেয়েছেন, একথা সুব্রত মুখার্জি বললেও আকবর আলি খোন্দকার দাবি করেছেন এটা কোলাঘাটে ঘটেছে।

৬ই জানুয়ারি আনন্দবাজার লেখে—'অজিত পাঁজা আজ প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়েই আক্রমণ করেছে সি পি এম।...মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরীরের কাছেই বোমা ছোঁড়া হয়েছিল এবং সেটির টুকরো এসে তাঁর পায়ে লাগে। তাঁর (পাঁজার) বক্তব্য মমতাকে আক্রমণের লক্ষ্যেই বোমা ছোঁড়া হয়েছিল।"

পুলিসের রিপোর্ট : ৫ই জানুয়ারি ২০০১ তারিখে পুলিশের রিপোর্ট উদ্ধৃত করা হয় প্রতিদিন পত্রিকায়, লেখা হয়—'বুধবার কেশপুরের হাঙ্গামায় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর কোনো আক্রমণই চালানো হয়নি বলে প্রাথমিক তদন্তের পর রিপোর্ট দিল জেলা পুলিশ। ঘটনার তদন্তকারী অফিসার জিৎ রাম ভকত বুধবারের ঘটনা নিয়ে বৃহস্পতিবার তদন্তে নামেন।

সারাদিন ধরে তিনি বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় তদন্ত করেন। এরপর জেলা পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দেওয়া জিৎ রাম ভকতের তদন্ত রিপোর্টে বলা হয় যে বুধবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আক্রান্ত হননি।

মমতার নিরাপত্তারক্ষীদের বক্তব্য : ৬ই জানুয়ারি ২০০১ সালে আজকাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে মমতার দিকে পাথর ছোঁড়ার কোনো ঘটনা ওই রাতে ঘটেনি বলেই রেলমন্ত্রীর অভিজ্ঞতা। ৬ই জানুয়ারি ২০০১ টাইমস অব ইন্ডিয়া লিখল — 'মমতা ব্যানার্জি শয্যাশায়ী হলেন কেন? নিশ্চিতভাবেই এর উত্তর হল সমালোচকদের মুখ রক্ষা করতে এবং ভোটারদের সহানুভূতি কুড়োতে।'

ছোটো আঙারিয়া, ২০০১

২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পাঁশকুড়া লাইনে গাড়ি ছোটানো রেলমন্ত্রী স্লোগান দিয়েছিলেন, 'গ্রাম থেকে কলকাতা, পথ দেখাবে গড়বেতা'। বছরের শুরুতেই ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে সি পি আই (এম)-এর হাতে ১১ জন তৃণমূলকর্মী খুন হয়েছেন বলে দাবি করা হয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। বাজারী সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার চালানো হয় যে দুটি ট্রাকে করে মৃতদেহগুলি পাচার করে দেওয়া হয়েছিল। ঘটনার পরের দিন যে এফ আই আর করা হয়েছিল তাতে যে অসংখ্য নিখোঁজ ব্যক্তিদের নাম ছিল তারা নিখোঁজই থেকে গেছেন। ৮ই আগস্ট ২০০১ সালের আনন্দবাজার খুললে দেখা যাবে যে তারাও লিখেছে—"মঙ্গলবার সি বি আই সূত্রে জানা যায়, সি বি আই তাদের তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে কিছু বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। ছোটো আঙারিয়ার সেই বাড়িতে জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল। ওই বৈঠকে প্রচুর বিস্ফোরক ও অস্ত্র জমা করা হয়েছিল। পরে প্রমাণিত হয়েছিল ছোটো আঙারিয়ার ঘটনায় যারা মারা গিয়েছিল তারা জনযুদ্ধের কর্মী।

বক্তার কাণ্ড, ২০০১

ছোট আঙারিয়ার বক্তারের কথা আজ হয়তো অনেকের মনে নেই। তৃণমূল এবং জনযুদ্ধের যৌথবাহিনী তখন ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছে কেশপুর-গড়বেতা-পিংলা-সবংসহ পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। ছোটো

নির্বাচনী বৈতরণী পার করতে চেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। একটা খুনের ঘটনাকে 'রাজনৈতিক' আখ্যা দিয়ে। ওই অঞ্চলের পার্টি নেতৃত্ব সুহৃদ দত্তকে ওই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে 'সাজানো কেস' চালু করিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে এই ঘটনার নানা বিকৃত ছবি দেখিয়ে মিডিয়া বাম বিরোধিতার পালে হাওয়া তুলেছিল। সুহৃদ দত্ত, দেবু মালিকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের খবর ফলাও করে ছাপা হয়েছিল সংবাদপত্রে, হোর্ডিং-এ পোস্টারে। ষড়যন্ত্র করে চেপে যাওয়া হয়েছিল সুহৃদ দত্তকে বিনা অনুমতিতে দিল্লি নিয়ে গিয়ে তাঁর পলিগ্রাফ টেস্টের ব্যাপারটি। যা নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় সংবিধানের ২১নং ধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিহীন। এরপরে যখন মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ তাদের জামিন মঞ্জুর করেন—তখন তৃণমূলী নেতাদের অনেককেই বলতে শোনা গিয়েছিল, 'রাজশক্তির চাপে জামিন'—হয়তো আইনে পারদর্শী তৃণমূলী নেতারা ভুলে গিয়েছিলেন মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ আইয়ারের উক্তি Bail is the Rule and Jail is the Exception C+V. হয়ত তাঁদের কাছে বামপন্থীদের জন্য Exception টাই Rule। এ প্রসঙ্গে আরেকটি উক্তির কথা স্মরণ করতে হবে—এই উক্তি করেছিলেন খোদ তৃণমূল নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়—'বিচারপতি প্রণব চট্টোপাধ্যায় সোমনাথ চ্যাটার্জির জুনিয়র ছিলেন তাই এই রায়'। হায়! এঁরাই বলেন বামপন্থীরা বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখেন না—ঘটনাচক্রে কোনো মনপসন্দ রায় না হলেই এঁরা আদালত, বিচারপতির পদমর্যাদা ইত্যাদির কোনো পরোয়া করে না।

রিজওয়ানুর রহমান, ২০০৭

২১শে সেপ্টেম্বর ২০০৭ আত্মঘাতী হয় রিজওয়ানুর রহমান। রাজ্য সরকারকে জড়িয়ে শুরু হয় চূড়ান্ত মিথ্যাচার। মৃত ভাইয়ের নাম ভাঙিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা ওঠাতে চান রিজওয়ানুরের ভাই রুকবানুর। সংখ্যালঘু মানুষকে ভুল বোঝাবার আরো একটা তাস হাতে পেয়ে যান মমতা ব্যানার্জি। আর তাঁকে সায় দিতে থাকে সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমগুলি। প্রথম থেকে জানা ছিল 'এটা আত্মহত্যার ঘটনা'—প্রথম থেকেই উঠে আসছিল তৃণমূল নেতা ও বিধায়ক জাভেদ খান-এর নাম। এটা চাপা দিতে শুরু হয় তৃণমূলী বন্ধু

পার্থসারথী বসুর সহযোগিতায় সি বি আই তদন্ত। এখন তদন্তের পর আর কেউ না বলুক দেশের সি বি আই-ও বলছে 'রিজওয়ানুরের মৃত্যু একটি আত্মহত্যা।' আর মানুষ এই রাজনীতির কারবারীদের বলছেন 'না'। কলকাতার পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রবল হাওয়াতেও জিততে পারেনি তৃণমূল প্রার্থী রুকবানুর রহমান। হেরে গেছেন জাভেদ খানও। মমতা ব্যানার্জির মতে 'ফাঁসিয়ে দেওয়া' হলেও সি বি আই-এর দুর্নীতি বিরোধী শাখার হাতে উল্টোডাঙার মোড়ে পার্থসারথী বসু ধরা পড়ে যান ২৮শে ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে। অনেক সত্যকে উলটে দেওয়া পার্থসারথী বসুর উল্টোডাঙায় ধরা পড়ার ঘটনায় আর কিছু হোক বা না হোক তৃণমূল নেত্রী অন্তত বললেন পার্থসারথীকে ফাঁসানো হয়েছে।

মুনমুন যাদব কাণ্ড, ২০০৯

৬ই জানুয়ারি, ২০০৯, কলকাতা হাইকোর্টের সামনে আইন ভাঙার অপরাধে মুনমুন যাদব নামে এক ট্যাক্সিচালকের সঙ্গে পুলিশের বচসাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড সৃষ্টি করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেআইনি পার্কিং করা ওই ট্যাক্সি চালককে পুলিশ মেরেছে এই অজুহাতে তৃণমূল কর্মীরা পথ অবরোধ করে এবং পুলিশকে আক্রমণ করে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান তৃণমূল নেতা পার্থ চ্যাটার্জি, সৌগত রায় এবং স্বয়ং তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ পুলিশ ওই ট্যাক্সিচালকের চোখ উপড়ে নিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে পরিষ্কার হয় আসল সত্য। ওই ট্যাক্সিচালক মুনমুন যাদব মিডিয়ার সামনে বলেন—পুলিশ তাকে মারেনি। পুলিশের সাথে বচসা ও ধাক্কাধাক্কি হয়েছে মাত্র। পরে পুলিশ তাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে মুনমুন যাদবকে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। ততক্ষণে বেগতিক দেখে পালিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাপস মিত্র খুন, ২০০৯

বনগাঁ পুরসভার ২নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তাপস মিত্র খুনের তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, তাঁকে খুন করানোর জন্য ওই পৌরসভার তৃণমূল

পৌরপিতা শঙ্কর আঢ্য ভাড়াটে খুনী লাগিয়েছিল। তাপস মিত্র খুন হন ২২শে জুন তারিখে আর পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তৃণমূল কাউন্সিলর শঙ্কর আঢ্য স্বীকারোক্তি দেন যে তাপস মিত্রকে খুন করতে ১১ লক্ষ টাকার সুপারি দিয়েছিলেন।

নিশিকান্ত মণ্ডল হত্যা, ২০০৯

২০০৯ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর খুন হন নন্দীগ্রামের তৃণমূলী পঞ্চায়েত প্রধান নিশিকান্ত মণ্ডল। আর পরেরদিন আনন্দবাজার পত্রিকা লিখল—'তৃণমূলের তরফে এই ঘটনায় সি পি এমের দিকেই অভিযোগের আঙুল তোলা হয়েছে। নন্দীগ্রাম জুড়ে এরপরেই সি পি এম সমর্থকদের বাড়িঘর ভাঙচুর শুরু হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রের খবর।' এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে এক সি পি আই (এম) সমর্থককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কিন্তু নিশিকান্ত খুন হবার পর থেকেই বাড়তে থাকে সন্দেহের মাত্রা। ৮ই অক্টোবর ২০০৯ তারিখে আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়—নন্দীগ্রামের সোনাচূড়া পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান নিশিকান্ত মণ্ডল হত্যার দায় স্বীকার করে নিল মাওবাদীরা। বৃহস্পতিবার সোনাচূড়াতেই সি পি আই (মাওবাদী)'র নন্দীগ্রাম জোনাল কমিটির তরফে সেলিম স্বাক্ষরিত লিফলেট মিলেছে। লিফলেটের বক্তব্য 'রাজার মতো আচরণ, ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারের জন্যই নিশিকান্ত মণ্ডলকে গণআদালতে চরম শাস্তি দেওয়া হল।' ১০ই অক্টোবরের আনন্দবাজারেই লেখা হয়—"নিশিকান্ত খুনে দায় স্বীকার কিষেণজিরও"। যদিও ৯ই অক্টোবর শুভেন্দু অধিকারী পুরো ব্যাপারটাকে সি পি এম-এর কারসাজি বলে চালাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কিষেণজির বিবৃতিতে আবার প্রকট হয়ে গেল তৃণমূলের মিথ্যাচার। নিশিকান্ত মণ্ডলকে সি পি এম হত্যা করেনি। কিষেণজিও জানিয়ে দিয়েছেন—দুর্নীতিগ্রস্ত নিশিকান্ত মণ্ডলকে তারাই হত্যা করেছিলেন। ১০ই অক্টোবর বর্তমান পত্রিকাতেও লেখা হয়—'নিশিকান্ত খুনের দায় স্বীকার করলেন কিষেণজি।

বিষ মদে মৃত্যু ও দেহ লোপাটের গল্প, ২০০৯

৩রা ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে কলকাতার হাইড রোড এলাকায় বিষমদ পান

করে ১৪ জনের মৃত্যু হয়। পরে ছেলের মৃত্যুর খবর জানতে পেরে একজন মহিলা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এই মৃত্যুরও রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে ময়দানে নেমেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। দু-তিনজন মৃতের বাড়িতে গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মৃতদের পরিবারপিছু ১০ হাজার টাকা করে দেবেন। আর সেদিনও তাঁর দাবি ছিল 'আরো কয়েকটি দেহ সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।' চোলাই মদে যেখানে মৃত্যু হয়েছে সেখানে গিয়ে রাজনীতির খেলা মমতা ব্যানার্জি খেলতে চেয়েছিলেন। ছোটো আঙারিয়া, নন্দীগ্রামের মতো 'লরি লরি' দেহ না হলেও 'কয়েকটি দেহ' সরিয়ে নেওয়ার নির্দিষ্ট তথ্য দেওয়া তৃণমূল নেত্রী আজও পারেননি সেই নিখোঁজ দেহগুলির স্পষ্ট কোনো খোঁজ দিতে।

রাজধানী এক্সপ্রেসে মাওবাদী হামলা, ২০০৯

২৭শে অক্টোবর রাজধানী এক্সপ্রেসের ওপর সশস্ত্র হামলা চালালো তৃণমূল-মাওবাদী ও যৌথ বাহিনী। তৃণমূল-মাওবাদীদের জনসাধারণের কমিটির সশস্ত্র লোকজন রাজধানী এক্সপ্রেসটিকে প্রায় সাড়ে ৪ ঘণ্টা আটকে রাখে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীর এজেন্ট ও জঙ্গলমহলের পুলিশি সন্ত্রাসবিরোধী জনসাধারণের কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতোর মুক্তির দাবিতে রাজধানী এক্সপ্রেসে এই হামলা চালানো হয়। প্রত্যেকবারের মতো এইবারেও রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি রাজধানী এক্সপ্রেস আটকানোর খবর পাওয়া মাত্র বলেন 'মাওবাদীরা বলে দিয়েছে তারা একাজ করেনি'। তাহলে কে করেছে? মাওবাদীদের নাম করে মার্কসবাদীরাই। মমতা ব্যানার্জি এদিন তাঁর বক্তব্যে প্রথমে 'মার্কসবাদী' এবং পরে 'এরা' শব্দ ব্যবহার করেন এবং আসল ঘটনাটিকে আড়াল করতে থাকেন। তিনি অবরোধের পাঁচঘণ্টা বাদে মাওবাদী বা তাদের প্রকাশ্য সংগঠন জনসাধারণের কমিটির নাম না করে ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। আসলে এই ঘটনারও দায় স্বীকার করেছিলেন মাওবাদীরা এবং তাদের নেতা কিষেণজি এবং এবারেও মমতা ব্যানার্জির বিবৃতি মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এমনকি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্য শিশির অধিকারী জানান যে তিনি নাকি জানতেন যে এমন ঘটনা ঘটবে। তিনি আরো বলেন সোমবার রাত সাড়ে সাতটা নাগাদই তিনি এমন কথা জানতে পারেন।

সোমবার বিকাল থেকে রাত অবধি তিনি মেদিনীপুরেই ছিলেন। তিনি সেখানে তৃণমূল নেতা সলিল সাহার বাড়িতে সন্দেহভাজন মাওবাদী উগ্রপন্থীদের সাথে বৈঠক করেন এবং তার পরদিন থেকে লাগাতার বন্‌ধের ডাক দেয় মাওবাদীরা। এরপরেও তৃণমূল নেত্রীর এই বিবৃতি নিতান্তই ভিত্তিহীন।

বাসন্তী কলোনি : তৃণমূলের অবরোধে আটকে গেল দমকল, ২০১০

১২ই জানুয়ারি, মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে গেল উল্টোডাঙার ৪নং বাসন্তী কলোনির ৪৫০টি ঘর। আগুন যখন গ্রাস করছে গরিব বস্তিবাসীর সর্বস্ব, ঠিক তখনই চলছে তৃণমূল কংগ্রেসের পথ অবরোধ কর্মসূচি। বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমে আগুন লাগার কথা জানার পরেও অবরোধ তুলে নেয়নি তৃণমূল কংগ্রেস। আগুন ক্রমশই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে এটা জেনেবুঝেই অবরোধ তোলেনি তৃণমূল। আসলে এই বস্তির মধ্যেই এন ডি এ সরকারের রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ৪০ কাঠা জমিতে একটি থ্যালাসেমিয়া হাসপাতালের শিলান্যাস করিয়েছিলেন মিঠুন চক্রবর্তীকে দিয়ে। আজও কাজ একবিন্দুও এগোয়নি। এবারের রেল বাজেটে ওই প্রস্তাবেই মাল্টিপ্লেক্স বানানোর কথা বলেছিলেন রেলমন্ত্রী। সেই স্বার্থেই কি আগুনকে বাড়তে দেওয়ার রাস্তা করে দেওয়া ? প্রশ্ন থেকে গেছে। দমকল যদি আটকে রাখা যায় তাহলে আগুন ছড়িয়ে পড়বে দ্রুত। সর্বস্বান্ত হবেন গরিব মানুষ আর তাতেই সহজে দায়ী করা যাবে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে। ওটাই ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের লক্ষ্য। একবছর পর বাসন্তী কলোনিতে সম্পূর্ণ হয়েছে পুনর্গঠনের কাজ। কলকাতা পুরসভার বামপন্থী পুরবোর্ডের প্রতিশ্রুতি মতো গড়ে উঠেছে পাকা বাড়ি। তৃণমূলী চক্রান্তের ফাঁদে পা দেয়নি বাসন্তী কলোনি। হিটলারি কায়দায় রাইখস্ট্যাগ বানানোর ষড়যন্ত্রকে রুখে দিয়েছে সে।

স্টিফেন কোর্ট, ২০১০

স্টিফেন কোর্ট নামক পার্ক স্ট্রিটের এই বহুতলে ২৩শে মার্চ ২০১০-এ এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়। এতে প্রাণ হারান ২৪ জন মানুষ। বাড়িটি দেড়শো

বছরের পুরোনো ছিল এবং এতে অগ্নিনির্বাপক কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। এদিন আগুন লাগার ১০ মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে দমকলের ১৫টি ইঞ্জিন আসে। ঘটনাস্থলে দাঁড়ানো প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন পঞ্চমতলার রান্নাঘর থেকে প্রথম আগুন জ্বলেছে। আবার কেউ কেউ বলেন লিফট থেকে ছড়িয়েছে আগুন। ২৫শে মার্চ গণশক্তি পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় যে এই বহুতলের ছাদের দরজা বন্ধ ছিল এবং এই একটি দরজাই ১৭টি প্রাণ বাঁচাতে পারত বলেন দমকল বিভাগের কর্মী। ২৬শে মার্চ গণশক্তিতেই প্রকাশিত হয় এক চাঞ্চল্যকর খবর, স্টিফেন কোর্টের মালিক সঞ্জয় বাগাড়িয়া নিজস্ব মুনাফার জন্য ছাদটি বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানিকে ভাড়া দেন আর তারপর থেকে ছাদে তালা পড়ে যায়। সাততলার ফ্ল্যাটের বাসিন্দা গৌরী গুহনিয়োগী বলেন যে দরজা খোলা থাকলে ওরা সব বেঁচে যেতে পারত। স্টিফেন কোর্ট অগ্নিকাণ্ডের তদন্তের ভার নেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা। স্টিফেন কোর্ট অগ্নিকাণ্ডেও নাটক করতে ছাড়েনি তৃণমূল নেতারা। তারা বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন ২৩শে মার্চ হঠাৎ করে ঢুকে হইচই ফেলে দেন এই বলে যে 'অভিজাত এলাকা পার্ক স্ট্রিটে কেন আগুন লাগবে ?' তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি স্বয়ং পার্ক স্ট্রিটে জনা পনেরো কর্মী নিয়ে হাজির হয়ে যান। বিধায়ক মানস ভুঁঞ্যা আর এক ধাপ এগিয়ে বলেন, এখনই দমকল মন্ত্রীকে বিধানসভায় এসে বিবৃতি দিতে হবে।

জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ড, ২০১০

২০১০ সালের ২৮শে মে গভীর রাতে রেললাইনে নাশকতায় ঝাড়গ্রামের সরডিহা ও খেমাশুলির মাঝে হাওড়া থেকে কুরলাগামী আপ জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস মারাত্মক দুর্ঘটনায় পড়ে। যার বলি হন ১৭০ জন যাত্রী আহত হন ১৫০-এরও বেশি। রেলমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা ব্যানার্জি সেদিন রাতেই রওনা হন এবং ভোরেই পৌঁছে যান অকুস্থলে। সেখানে দাঁড়িয়েই তিনি বলেন "এটা একটা রাজনৈতিক চক্রান্ত। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য পুরভোটের দুদিন আগে ঘটনা ঘটানো হয়েছে। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে সি পি এম-এর দিকেই ইঙ্গিত করেছেন রেলমন্ত্রী—আনন্দবাজার পত্রিকা,

৩০শে মে, ২০১০। জ্ঞানেশ্বরী গণহত্যার তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছে সি বি আই, আর এই হত্যাকাণ্ডে ধৃত কাশী মাহাতোসহ অন্যদেরকে জেরা করে এই ঘটনা ঘটানোর পেছনে মাওবাদীরাই যে মূল চক্রী তা প্রমাণ হয়ে গেছে।

সাঁইথিয়া কাণ্ড, ২০১০

২০১০ সালের ১৯শে জুলাই রাত ২টা বেজে ৫মিনিটে অণ্ডাল হয়ে রাঁচিগামী বনাঞ্চল এক্সপ্রেসকে সাঁইথিয়া স্টেশনেই সজোরে ধাক্কা মারে শিয়ালদহমুখী উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস। এই দুটি ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয় ৬৭ জনের। গুরুতর আহত হয়ে ৮৯ জন যাত্রী সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি হন। তৃণমূলের মুখ্যসচেতক অশোক দেব অবলীলায় বলেন ২১শে জুলাই মমতার সমাবেশ বানচাল করতেই নাকি সাঁইথিয়ায় এমন দুর্ঘটনা ঘটানো হয়েছে এবং এও বলেন যে সি পি এম এ কাজ করেছে। ২১শে জুলাই ২০১০-এর গণশক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় রেলের যান্ত্রিক গোলযোগের কথা। শতাব্দী প্রাচীন ট্রিবিউনে ২০শে জুলাই সম্পাদকীয়তে 'আরও একটি দুর্ঘটনা, রেলের জন্য জরুরি একজন পূর্ণ সময়ের মন্ত্রী' বলা হয়। 'দশ মাসে ১৪টি দুর্ঘটনা, দু মাসে দ্বিতীয়বার পশ্চিমবঙ্গে'—দ্য হিন্দু সম্পাদকীয়তে বলা হয়। মেইল টুডে আরও সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে জানায় 'গত বছর তিনি (মমতা ব্যানার্জি) মন্ত্রকের দায়িত্ব নেওয়ার পর রেল দুর্ঘটনায় এ পর্যন্ত প্রায় ২৭০ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন'। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস লিখেছিল—'ওর রাজনীতির ধরনই হল অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানো, গলাবাজি করা, আর জনগণের চোখে ঠুলি পরানো। এর জন্য উনি কোনো প্রমাণের ধার ধারেন না। ভারতীয় রাজনীতি অনেকদূর এগিয়ে গেলেও তিনি পড়ে আছেন সেই মান্ধাতা আমলেই। একেবারে শেষের এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে তিনি যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, তাতে কাণ্ডারী হিসাবে তাঁকে আর বহন করার ঝুঁকি নেওয়া রেলের আদৌ ঠিক হবে না।'

গুর্জন্ত সিং কাণ্ড : বর্তমান ২২.৮.২০১০

নিরীহ ট্রাক ড্রাইভার গুর্জন্ত সিংকেও জেল খাটিয়েছেন মমতা ব্যানার্জি। ৯ই আগস্ট ২০১০ সালে লালগড়ে মাওবাদী তৃণমূলের অরাজনৈতিক 'শান্তি

সমাবেশ' থেকে ফেরার সময় দুর্ঘটনায় পড়ে মমতার গাড়ি। গুজব ছড়ানো হতে থাকে সি পি আই (এম) মমতাকে হত্যার চেষ্টা করেছে। যাই হোক এটা ছিল একটি দুর্ঘটনা। তবুও নিরীহ গুর্জন্ত সিংকে কয়েকদিন পুলিশি হেফাজতে রাখার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। আবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই নির্লজ্জ ঘটনায় রাজ্যের মানুষকে তো বটেই, এমনকি তৃণমূলী রাজনীতির অঘোষিত মুখপত্র বর্তমান পত্রিকাতেও নিন্দা করে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আসুন দেখি, বর্তমানের সম্পাদিকা শুভা দত্তের বিবেক কিভাবে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল গুর্জন্ত সিংয়ের ঘটনা।

গুর্জন্ত সিং কাণ্ড সম্পর্কে ২২.৮.২০১০ তারিখে বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত শুভা দত্ত-র রিপোর্ট—

"লোকসভা নির্বাচন এমনকি পঞ্চায়েত জয়ের পরেও তৃণমূলের মধ্যে আজকের এই শক্তিমত্ততা, নেতা-নেত্রীর আচরণে এমন ঔদ্ধত্য অহংকার এবং হিংসার আভাষ দেখা যায়নি। পুরসভা জয়ের পর গোটা দলটা যেন মনে করতে শুরু করেছে, একেবারে দিল্লি জয় হয়ে গিয়েছে। চেয়ারে বসে একেবারে দুঁদে গোয়েন্দা অফিসারের মতো সি পি এম-এর দুর্নীতি খুঁজতে বেড়িয়ে পড়েছে। অফিসারদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে শুনলাম কাউন্সিলরের চ্যালারা। একটা খারাপ টিউবওয়েল নিয়ে সম্পূর্ণ অকারণে একজন অফিসারকে নাকি বন্ধ করে প্রচণ্ড মেরেছে। এসবই ওই রাজনৈতিক শক্তি পরিসর বাড়ানোর চেষ্টা। এক্ষেত্রে তৃণমূলও কিন্তু ক্ষমাহীন। উপায় নেই, এটাই নাকি রাজনৈতিক বাধ্যতা। না হলে কোনো রাজনৈতিক দল নাকি সার্ভাইভ করতে পারবে না। বলছেন রাজ্যের রাজনৈতিক মহল। এই ক্ষমাহীনতারই একটা নির্মম উদাহরণ দেখলাম পরবর্তীকালে লরি কাণ্ডে ও মমতাকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ নিয়ে ক'দিন তৃণমূলের দাপাদাপিতে। আমরাও বিশ্বাস করে প্রথমদিকে খবরটা গুরুত্ব দিয়ে প্রথম পাতায় ছেপেছি। কিন্তু পরে খোঁজ নিয়ে বুঝেছি, গোটাটাই একটা পলিটিক্যাল গেম আর এই গেম-এর বলি একজন গরিব পাঞ্জাবী লরি চালক : গুর্জন্ত সিং। ব্রেকে যান্ত্রিক ত্রুটির জন্যই মমতার কনভয়ের একটি গাড়ির সঙ্গে তাঁর লরির সামান্য সংঘর্ষ হয়। একজন সামান্য আহত হন। প্রাথমিকভাবে কেউই ঘটনাটিকে তেমন আমল

দেয়নি। তবুও কনভয়ে ঢোকার অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর হঠাৎ পরদিন, কি তারপর দিন শুনলাম তাঁর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে যে ১০ বছরের জেল নিশ্চিত। যিনি অভিযোগ করেছেন তিনি ঘটনাস্থলেই ছিলেন না। আর বেচারি গুর্জন্ত সিং। নতুন করে গ্রেপ্তার হয়ে হতভম্ব। সকলেই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সত্যটা জানতেন। কিন্তু সত্যটা কেউই মানলেন না। মেট্রো চ্যানেলে দিদির অনুগত ভাইরা খুনের ষড়যন্ত্র নিয়ে গলা ফাটালেন, রাজ্যপালের কাছে গেলেন, লোকসভায় ফাটাফাটি করলেন। অথচ মানুষ গুর্জন্তের কথা একবারও তাঁর মনে হল না...আমার প্রশ্ন ভিন রাজ্যের গরিব মানুষকে এইভাবে রাজনীতির পাকচক্রে জড়িয়ে কি লাভ?...এসব দেখে শুনে আমার মনে হচ্ছে এক আশ্চর্য ক্ষমাহীন রাজনীতির চোরাস্রোতে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। আমার ভাবনা যদি সত্যি হয়, তাহলে বলতেই হবে পশ্চিমবঙ্গের আজ বড় দুর্দিন।

মেট্রো রেলের সম্প্রসারণ নিয়ে মিথ্যাচার

১৯৯৮ সালের ১৫ই নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল তৎকালীন রেলমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সঙ্গে রাজ্যের বকেয়া রেল প্রকল্পগুলি শেষ করবার দাবিতে দু'দফায় বৈঠক করেন। এই বৈঠকের শেষে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী জানান মেট্রো রেল ও চক্ররেল সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনায় বসা হবে। প্রত্যাশিতভাবেই সর্বদলীয় বৈঠকে হাজির হননি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা। এই বৈঠকেই কলকাতার মেট্রো রেল পরিষেবা সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত হয়। যার মধ্যে অন্যতম হল—

১। শহরতলির রেল পরিষেবাকে উন্নত করতে গড়া হয় একটি সমন্বয় কমিটি। রাজ্যের তৎকালীন পরিবহনমন্ত্রী প্রয়াত সুভাষ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে রেলওয়ে বোর্ড ও রাজ্য সরকারের পদস্থ অফিসাররা এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত হন। কমিটিতে রাখা হয়েছিল পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, মেট্রো এবং উত্তর সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজারকে।

২। ১৫ই নভেম্বর বৈঠকের পরে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে মেট্রোরেলের সম্প্রসারণে ৬৫০ কোটি টাকা লাগবে। রেলমন্ত্রী নীতিশকুমার জানান যে কেন্দ্রীয় সরকারের একার পক্ষে ওই অর্থ দেওয়া সম্ভব নয়। ঠিক হয় পরবর্তী সময়ে আলোচনার মাধ্যমে ওই টাকার বরাদ্দ করা হবে।

পরবর্তীকালে গড়িয়া থেকে টালিগঞ্জ মেট্রো সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পরে স্থির হয় যে সমগ্র প্রকল্পের ২/৩ অংশ দেবে কেন্দ্রীয় সরকার আর ১/৩ অংশ দেবে রাজ্য সরকার।

বামপন্থী সাংসদরা দাবি তোলেন যে শুধু সম্প্রসারণই নয় বিভিন্ন রেল স্টেশনের সঙ্গে মেট্রো স্টেশনগুলির যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। এই দাবিতে কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপিও জমা দেন বামপন্থী প্রতিনিধিরা।

১৮.৩.২০০৯ তারিখে মমতা ব্যানার্জি রেলমন্ত্রী হননি। ওই দিনে মেট্রো রেলের হিসাব বিভাগ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন দপ্তরের সচিব ডি কে বক্সির কাছে রাজ্য সরকারের দেয় অর্থের সম্পূর্ণ হিসাব দেন মেট্রো রেলের তরফে শ্রী কাজল ঘোষাল। তাতে উল্লেখ করা হয় রাজ্য সরকার তাদের চাহিদার ৪৭ কোটি টাকার মধ্যে ৩৫ কোটি টাকা দিয়ে দিয়েছে। রাজ্যের দেয় ৩৩ শতাংশ টাকার একটা বড় অংশ রাজ্য সরকার দিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু ২০০৯ সালের ২০শে মে রেলমন্ত্রী হবার পর মমতা ব্যানার্জি তড়িঘড়ি ২২শে আগস্ট অসম্পূর্ণ অবস্থায় মেট্রো রেলের সম্প্রসারিত অংশের উদ্বোধন করে দেন এবং দাবি করেন এই পুরো প্রকল্পটিই নাকি তাঁর দান। মমতা ব্যানার্জি যে প্রকল্পের সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত ছিলেন না, যাঁর মন্ত্রী হবার আগেই প্রকল্পের সিংহভাগ কাজ শেষ হয়ে গেছিল এবং যে প্রকল্পে রাজ্য সরকারের এক-তৃতীয়াংশ অংশীদারীও ছিল সেই প্রকল্পকে হঠাৎ করে উদ্বোধন করে দিয়ে তার পুরো কৃতিত্ব দাবি করাকে মিথ্যাচার ছাড়া আর কি বলা যায় আমাদের জানা নেই।

এবার আসুন ওই একই প্রকল্পে তৃণমূল কংগ্রেস এবং মাননীয়া রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ঠিক কি ভূমিকা ছিল একবার ফিরে দেখা যাক—

তৃণমূল নেতারা প্রথম থেকেই টালিনালার জবরদখলকারীদের উচ্ছেদের বিরোধিতা করেছে। মমতা ব্যানার্জির বাধায় কলকাতা পুরসভা উচ্ছেদ

অভিযান থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। যদিও কলকাতা পুরসভার তৎকালীন মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায় বার বার জানিয়েছেন তিনি উচ্ছেদের পক্ষে। এই নিয়ে সংঘাত এমন পর্যায় পৌঁছায় যে মমতা ব্যানার্জি মেয়রের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নেওয়ার কথাও ভাবেন। (আ.বা.প. ২৩.৯.২০০১)

বহু বাধা বিপত্তির পর উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয় ২২.৯.২০০১ তারিখে। উচ্ছেদ অভিযানের শেষ পর্বে মমতা ব্যানার্জি সেখানে হাজির হন। মহিলা পুলিশের সঙ্গে কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর তিনি গড়িয়া মোড়ে পৌঁছে রাস্তার মাঝে টুল পেতে বসে পড়েন এবং চারিদিকে অবরোধের চেহারা নেয়। ইতিমধ্যে চারিদিকে খবর চলে যায় তৃণমূল নেত্রীকে আক্রমণ করা হয়েছে। অদূরেই ছিলেন সৌগত রায় এবং পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরাও দলীয় কর্মীদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। যেহেতু জবরদখলকারীদের পক্ষ থেকে সেই ধরনের কোনো বিরোধিতা আসেনি, তাই উচ্ছেদ অভিযান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

যে প্রকল্পের কাজে প্রথম থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস বাধার সৃষ্টি করেছিল আজ সেই প্রকল্পেরই কৃতিত্বের দাবিদার হওয়ার প্রচেষ্টাকে কি বলে অভিহিত করা যায় আমাদের জানা নেই।

তৃণমূলের নির্বাচনী ইশতেহার এবং মিথ্যাচার

২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রকাশিত তৃণমূলের ইশতেহারে বলা হয়েছিল যে তারা বিলগ্নীকরণের বিরোধিতা করবে। ৪ঠা অক্টোবর ২০০৯ সালে যখন ইউ পি এ ২ সরকার লাভজনক সংস্থা বিলগ্নীকরণের সিদ্ধান্ত নিল — নেত্রী বললেন — "আমি মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম না" — আসলে নেত্রী ভুলে গেছেন ভারতীয় সংবিধান-মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বা কাজকে Collective Responsibility বা যৌথ দায়বদ্ধতার দ্বারা পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু মমতা ব্যনার্জি তা মানেন না তাই বিলগ্নীকরণের বিরোধিতার বেলায় তাঁর সাফাই তিনি মন্ত্রিসভার বৈঠকে ছিলেন না। অমিত মিত্রের নেতৃত্বাধীন বিশেষ কমিটির তৈরি করা রেল ভিশন ২০২০তে খোলাখুলিভাবেই বাজার অর্থনীতির দাওয়াই মেনে প্রকাশ্যেই প্রতি বছর সংগঠিত শ্রম শক্তি (কর্মী সঙ্কোচন) হ্রাসের পক্ষেই সওয়াল করা হয়েছে!!

চরণ সিং এর চিঠি

এবারের লোকসভা ভোটে জয়ী হবার পর নেত্রীর হাতে দেখা গেল একটি চিঠি ভারতের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরণ সিং-এর। নেত্রী বললেন এবার বামফ্রন্ট সরকারকে যেতে হবে। সিদ্ধার্থ রায়-এর সরকার জাল নির্বাচনে জিতে মহাকরণে বসেছিল ৭২ সালের ২০শে মার্চ। চরণ সিং ৭৭ সালের ২০শে মার্চ কেন্দ্রে মোরারজি দেশাই সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন। ৩০শে এপ্রিল ৭৭ চিঠি পাঠান সিদ্ধার্থ রায়কে একই সাথে মেয়াদ উত্তীর্ণ করা অন্য কয়েকটি রাজ্য সরকারকেও চিঠি পাঠিয়েছিলেন চরণ সিং। রাজস্থান সরকার এর বিরুদ্ধে মামলাও করেন। যদিও কোর্ট চরণ সিং-এর চিঠিকেই মান্যতা দেয়। পঃবঃ-এ বিধানসভা নির্বাচন করবার জন্য। সেই সময় সিদ্ধার্থ রায় সরকারের বয়স ৫ বছর ১ মাস ১০ দিন। অসাংবিধানিক সেই সরকারের উদ্দেশ্যে চরণ সিং চিঠি দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন মেয়াদ শেষের পর ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা যায় না। সেই চিঠিকেই ২০০৯ সালে লোকসভার পর দেখানো শুরু করলেন মমতা। ২০০৯ সালে রাজ্যের সপ্তম বামফ্রন্ট সরকারের বয়স সবেমাত্র ৩ বছর। ঐ চিঠিকে মাত্র ৩ বছর অতিক্রান্ত করা সাংবিধানিক সরকারকে হঠাবার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চাইলেন তৃণমূল নেত্রী। সারা দেশ হয়তো হেসেছে। কিন্তু যে মিথ্যার মোড়ককে ব্যবহার করে পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা পেতে চাইছিলেন তাকে রাজ্যের মানুষ কোনোদিনই ক্ষমা করবে না।

জিনস পরিহিত মুক্তিযোদ্ধারা

১৫ এবং ২০শে জুলাই ২০০০ সালে আনন্দবাজারের পাতায় বেরোলো কেশপুরের যোদ্ধাদের ছবি। সশস্ত্র সেই যোদ্ধাদের শিহরণ জাগানো ছবি দেখিয়ে তৃণমূলের নেতারা 'সি পি এম'-এর সন্ত্রাস প্রমাণের প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। যদিও চেষ্টার অবসান ঘটল পরের দিন যখন ফাঁস হয়ে গেল যে ঐ ছবি সাজানো। গ্রামের মাঠে জিনস পরা যোদ্ধার ছবি ছাপিয়ে তৃণমূলের পালে হাওয়া তোলার মিথ্যে প্রচেষ্টা করেছিল আজন্ম কমিউনিস্ট বিরোধী আনন্দবাজার।

'গলায় দড়ি' — সমাজবিরোধীরা হলেন সহকর্মী

১৯৯৬ সালের একটি ঘটনার কথা। দিনটা সম্ভবত অনেকেই ভুলে গেছেন। মমতা ব্যানার্জি ভুলেছেন কিনা জানিনা তবে ভুলে যাননি তৎকালীন কংগ্রেস নেতা অধুনা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ও সাংসদ সোমেন মিত্র এবং কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুলতান আহমেদ। যদি ভুলে যান তাহলে বলতে হবে নেহাতই স্পর্শেন্দ্রিয়ের তেজ আছে। কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত। বাধ সেধেছেন মমতা। দাবি সমাজবিরোধীদের প্রার্থী করা চলবে না। সমাজবিরোধীদের প্রার্থী করা যাবে না বলে হাজরা মোড়ে গলায় কালো কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার হুমকিও দিয়েছিলেন সেদিনের যুবকংগ্রেস সভানেত্রী। কারা সমাজবিরোধী ছিলেন সেদিনের কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকায় — সুলতান আহমেদ, মৃণাল সিংহ রায়, অধীর চৌধুরী এবং শঙ্কর সিং। ১৪ বছরে কয়েক গ্যালন জল বয়ে গেছে গঙ্গায়। ২০১০ সালের পৌরসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ১৭ মে হাজরা মোড়ে সেই "পবিত্র স্থানে" মমতার দুই পাশে 'সমাজবিরোধীদের' মনোনীত করার দায়িত্বে থাকা তদানীন্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র এবং 'তরমুজ' বলে কথিত সুব্রত মুখার্জি আর পাশে সুলতান আহমেদ। একজন মমতার দাক্ষিণ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অন্যজন "সাংসদ"। যে কোনো 'সমাজবিরোধী' যদি 'সমাজবন্ধু' তকমা পেতে চান তাহলে তাদের আশ্রয় তৃণমূল কংগ্রেস। খোদ মমতাই সেই পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। ২০০১ সালেও এমন আর একটা ছবিও ধরা পড়েছিল। সেটা ৩ মে। সোনিয়া গান্ধী-মমতা ব্যানার্জি-শঙ্কর সিং — আরও এক 'সমাজবিরোধী' মমতার সঙ্গে একমঞ্চে। একই সভায়।

মৃত্যু তালিকা নিয়ে রাজনীতি

সংখ্যাটা ঠিক কি তৃণমূলের কেউই বলতে পারবেন না। কেউ বলেন ৮৫, কেউ বলেন ৫০০ আবার কেউ বলেন ৫৫০০০। কিন্তু মৃত্যু তালিকা নিয়ে ইচ্ছামতো দাবি এনারা পেশ করে থাকেন যখন-তখন। কিন্তু প্রথম থেকেই মৃতের তালিকায় বুজরুকি ধরা পড়েছে বারবার। ১৪ই মার্চ ২০০৭-এর নন্দীগ্রাম ঘটনার পর মৃতের তালিকা নিয়ে রাজনীতি করেছিল তৃণমূল। মিডিয়ার দৌলতে বিশ্ববাসী তখন জেনে গিয়েছেন সি পি আই (এম) কর্মীদের হাতে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু, লরি লরি লাশ পাচার,

শিশুদের পা ফাঁক করে চিরে হত্যা করার নিষ্ঠুর কাহিনি। হলদি নদী রক্তে লাল হয়ে যাওয়ার কিস্‌সাও। ঠিক কতজন মারা গিয়েছিলেন নন্দীগ্রামের ঘটনায়? আদালতে দেওয়া হলফনামায় দেওয়া হয়েছিল ১৪ জনের নাম। কিন্তু ১৪ জনের মধ্যে ১৪ নম্বর ব্যক্তিটির পরিচয় আজও অজ্ঞাতই থেকে গেছে। তৃণমূল সাংসদদের একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীকে যে ৮৩ জনের শহিদ তালিকা দিয়েছিল তাতে ধরা পড়েছে অসংখ্য বুজরুকি। ওই তালিকা অনুযায়ী তৃণমূলের শহিদ তৃণমূলের হাতে খুন হওয়া সি পি আই (এম) কর্মী অথবা তৃণমূলের বন্ধু মাওবাদী অথবা আড়াই বছরের শিশু। ধরা যাক নাকাশিপাড়ার রূপা বিশ্বাসের কথা। সি পি আই (এম) সমর্থক পরিবারের সন্তান অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী রূপাকে হত্যা করেছিল তৃণমূল বাহিনীর গুণ্ডারা। আবার এই রূপার নামও যুক্ত করে দিয়েছিল তাদের কল্পিত শহিদ তালিকায়। বারুইপুরের এক ব্যবসায়ী, যিনি জলজ্যান্ত ব্যবসা করছেন, তার নামও স্থান পেয়েছিল ওই কল্পিত শহিদ তালিকায়। এখানেই শেষ নয়। তৃণমূলের তালিকায় ৫২ নম্বরে রয়েছে অসিত সরকারের নাম। তিনি মাওবাদী হিসেবে দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন। এই অসিত সরকারও তৃণমূলের শহিদ। ২০০৯ বেদিক ভিলেজ ঘটনায় তৃণমূলের কর্মী আজিজুল ওরফে ক্ষুদে ও গফ্‌ফরের ছোঁড়া গুলিতে মারা যান আমিরুল ইসলাম। ক্ষুদে তৃণমূলের বিধায়ক আরাবুল ইসলামের ভাই। মধ্যমগ্রামের অভিজিৎ সাহা খুন হন ২০০৯ সালের নবমীর সন্ধ্যায়। হত্যাকারী হিসেবে অভিযুক্ত রাহুল এবং শম্ভু অধিকারী ছিল তৃণমূল কর্মী। তাই তৃণমূলের কোনো নেতৃত্বকেই অভিজিতের মরদেহে মাল্যদান করতে দেননি তার দাদা সন্তোষ সাহা। মজার ব্যাপার, মৃত্যুর পর অভিজিৎও তৃণমূলের শহিদ। তৃণমূলের দেওয়া শহিদ তালিকায় শেষের আগের নামটি ছিল মীরা লাসিন-এর, থানা নন্দীগ্রাম। কিন্তু জেলার নামেই গণ্ডগোল। তৃণমূলের তালিকায় নন্দীগ্রাম রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। আবার ধরুন তৃণমূলের শহিদ সনাতন হেমব্রম-এর কথা। সনাতন হেমব্রম ছিল মাওবাদীদের গণ মিলেশিয়ার সদস্য, তার পরিবারের লোকজনরাও সেই দাবিই করেছে। অথচ কলকাতার রাস্তায় সনাতনের দেহ নিয়ে মিছিল আমরা সবাই দেখেছি। গত ৭

জানুয়ারি তৃণমূলের তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে যে মৃতের তালিকা দেওয়া হয়েছিল তাতেও ধরা পড়েছে একটার পর একটা মিথ্যাচার। মানুষ এখন প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন—এই মিথ্যাচার কবে শেষ হবে? এই মিথ্যাচারের শেষ কোথায়?

'দেশদ্রোহী' থেকে 'দেশনায়ক'

১৯৬২ সালের চীন-ভারত সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে যখন কমিউনিস্ট বিরোধী মিথ্যাচারের ফোয়ারা ছোটাচ্ছিলেন তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মিডিয়া, তখনই আনন্দবাজারের পাতায় ১৯৬২ সালের ২২ অক্টোবর লেখা হয় — "ব্যারিস্টার কমরেড জ্যোতি বসু চীনের দালাল, দেশদ্রোহী ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই" ("প্রত্যক্ষ সমর দেশবাসীর দায়িত্ব") যখন জ্যোতি বসু সহ কমিউনিস্ট নেতারা গ্রেপ্তার হলেন — আনন্দবাজারের উল্লাস মাত্রা ছাড়িয়েছিল — "অবশেষে সরকারের চক্ষু খুলিয়াছে।" এই আনন্দবাজারের পাতাতেই ২৬ এপ্রিল ১৯৮৭-তেই "দেশদ্রোহী" জ্যোতি বসুকে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল 'রাষ্ট্রনায়ক' হিসাবে। আর ২০১০ সালের ১৭ জানুয়ারি কমরেড জ্যোতি বসুর মৃত্যুর পরে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে "ব্যবসা" করেছিল আনন্দবাজার। আসলে দেশদ্রোহী থেকে রাষ্ট্রনায়ক — কমিউনিস্ট নেতাদের মূল্যায়ন করতে আনন্দবাজারের এই সত্য উপলব্ধি মানুষের সামনে ওদের মিথ্যাচারেরই আরও একটা মুখোশ খুলে দিয়েছিল।

লালু-বাদশা

১৯৯০ সালের ১৬ আগস্ট হাজরা মোড়ে মমতা ব্যানার্জি দাবি করেন যে তাঁকে হাজরা মোড়ে হত্যা করার চেষ্টা করেছে সি পি আই (এম)। এই ঘটনার পর থেকেই সি পি আই (এম)-র বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের বন্যা বইতে শুরু করে। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত লালু আলম ও বাদশা আলম। এর সঙ্গে সি পি আই (এম) কে জড়িয়ে নানা কুৎসা প্রচারিত হতে থাকে। সি পি আই (এম) ঘটনার পরবর্তীকালেই বাদশা আলমকে বহিষ্কার করে। বহিষ্কৃত বাদশা আলম পরবর্তীকালে বি জে পি-তে যোগ দেন, আর যিনি

মমতা ব্যানার্জিকে মারার দায়ে সরাসরি অভিযুক্ত সেই লালু আলম ঠাঁই নেন তৃণমূলে। বাদশা আলম যখন বি জে পি-তে যোগ দিলেন তখন তৃণমূল-বি জে পি-র জোট। মজার কথা এখন লালু আলম এবং বাদশা আলম আছেন পরিবর্তনকামীদেরই সাথে।

ফ্যাক্স তঞ্চকতা

২২ জুন ২০০০, পৌরসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে, কলকাতার মুদিয়ালীতে এক সভায় তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর এক ফ্যাক্স বার্তা দেখিয়ে বলেছিলেন MAMCসহ সাতটি রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা খুলছে। কার্যত ২০০২ সালে এই কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। মমতার দেখানো ফ্যাক্স খুলতে পারেনি MAMC কারখানা। ২০১০ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিলাসরাও দেশমুখ রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন-এর কাছে MAMC-র মূল্য নিরূপণ করে ১৯০ কোটি টাকা। সম্প্রতি Bharat Earthmovers Ltd., Cool India এবং DVC একটি কনসোর্টিয়াম করে আদালত থেকে নীলামে MAMC কারখানা ক্রয় করেন।

বাইপাসের কয়লা হাসপাতাল — বোলো না আর মিছে কথা বোলো না

২০০৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি লোকসভা নির্বাচনের আগে তড়িঘড়ি করে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের ধারে কয়লা হাসপাতালের শিলান্যাস করেছিলেন মমতা ব্যানার্জি। ৭৪ জন কৃষকের থেকে জমি নেওয়া হয়েছিল। ন্যূনতম ১৬,৬৬৭ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা অবধি কৃষকদের দেওয়া হয়েছিল। সেই জমিতে কোনো হাসপাতাল হয়নি। ফাঁকা পড়ে আছে জমি। আজও। ২০০৬ সালে রাজ্যসভায় সি পি আই (এম) সাংসদ প্রশান্ত চ্যাটার্জির প্রশ্নের উত্তরে কয়লা দপ্তরের তৎকালীন রাষ্ট্রমন্ত্রী দশারী নারায়ণ রাও জানান যে ২০০৪ সালে কোল ইন্ডিয়া ও কলকাতা পৌরসভার মধ্যে মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। দশারী নারায়ণ রাও এও জানান যে এই হাসপাতালের জন্য বিজ্ঞাপন ও হোর্ডিং বাবদ খরচ হয়েছিল ৪৫ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা।

৭৪ জন কৃষকের জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ খরচ হয় ২৫ লক্ষ টাকা। মন্ত্রী অবশ্য এও জানাতেও ভোলেননি যে এ ধরনের হাসপাতাল গড়ে তোলার কোনো প্রকল্পর পরিকল্পনা কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের নেই!!

রেল নিয়ে মিথ্যাচার

শুধুমাত্র বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে নয়, পূর্বতন এন ডি এ সরকারের রেলমন্ত্রী থাকাকালীন সময়কাল থেকেই রেল এবং রেলের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে পরিকল্পিত মিথ্যাচারে সামিল হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং তাদের নেতা-নেত্রীরা। মিথ্যাচার যে দলের জন্মসঙ্গী, তারা যে রেল নিয়েও মিথ্যাচার করবে এ আর নতুন কী? অথচ গোয়েবলসীয় তত্ত্বের সার্থক প্রয়োগে পারদর্শী তৃণমূল কংগ্রেসই এখন বিভিন্ন সভা-সমিতিতে সি পি আই (এম)-কে মিথ্যাচারীর ভূমিকায় বসাতে চাইছে। কিন্তু আসল সত্যটা ঠিক কী? আসুন দেখে নেওয়া যাক কেন্দ্রীয় সরকার এবং তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া তথ্যের ফারাক।

মাননীয়া রেলমন্ত্রী তাঁর গত বছরের রেলবাজেটে বছরে ১০০০ কিলোমিটার নতুন রেলপথ পাতার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিলেন। এ বছরের বাজেটে তিনি জানান চলতি বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত নতুন রেল লাইন পাতা হয়েছে ৭০০ কিলোমিটার। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে নতুন রেলপথ পাতা হয়েছে মাত্র ৫৯ কিলোমিটার। একইভাবে রেলমন্ত্রীর দাবি অনুসারে রেললাইন ডাবলিংয়ের কাজও নাকি হয়েছে ৭০০ কিলোমিটার, যদিও এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী ডাবলিংয়ের কাজ হয়েছে মাত্র ৫৫ কিলোমিটার। এক্ষেত্রে আর্থিক সমীক্ষার রিপোর্টকে যদি মান্যতা দিতে হয় তাহলে ধরে নিতেই হয় মাননীয়া রেলমন্ত্রী সুকৌশলে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে রেল সম্পর্কিত তথ্যের বিকৃতি ঘটাচ্ছেন।

পরের পাতার সারণি থেকে একনজরে দেখে নিন গত দু'বছরের বাজেটে ঘোষিত রেলের কিছু প্রকল্প বর্তমানে ঠিক কী অবস্থায় আছে। অথচ শিলান্যাসে ঘাটতি নেই। নির্বাচন ঘোষণার আগে পর্যন্ত প্রতিদিনই শিলান্যাসের বন্যা বয়ে গেছে। একই প্রকল্পের একাধিকবার, একাধিক নামে শিলান্যাস,

আগের শিলা তুলে নতুন করে শিলান্যাস, এ সমস্তই মানুষ দেখেছেন। এমনকি সম্প্রতি নির্বাচন ঘোষিত হবার পরেও মাননীয়া রেলমন্ত্রী রেল বাজেটের জবাবী বক্তৃতায় নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ করে সংসদে দাঁড়িয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রেলের ভাঁড়ার শূন্য, প্রকল্প রূপায়ণের জন্য অর্থের সংস্থান নেই, তবুও প্রতিশ্রুতির কোনো খামতি নেই। অর্থাৎ প্রকল্পগুলি রূপায়িত হবার সম্ভাবনা নেই জেনেও তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন একের পর এক। এটাকে বোধহয় মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

দেশের রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলকে দিয়ে করানো শিলান্যাসের শিলা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে রেল, কারণ যে জমিতে শিলান্যাস হয়েছিল তা রেলের নয়। দেশের রাষ্ট্রপতি পদকে অসম্মান করার সংস্কৃতি ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের কোনো রাজনৈতিক দলই দেখাতে পারেনি। তৃণমূল কংগ্রেস এক্ষেত্রে অবশ্যই পথিকৃৎ।

২০০০ সালে শিলান্যাস হয় শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বরের মধ্যে ডাবল লাইন নির্মাণের। ২০০৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সেই শিলা পোঁতা ছিল শেওড়াফুলি স্টেশনের ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মের পাশে। তারপরেই সেই শিলার স্থান হয় পাশের কচুরিপানার পুকুরে। ২০০৯ সালের ৯ই ডিসেম্বর মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার সেই একই প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। এবার শেওড়াফুলি থেকে নালিকুল। ২০০০ সালের ২৬শে জুন নৈহাটিতে গঙ্গার ওপর এক সেতুর জন্য শিলা পুঁতেছিলেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জুবিলি সেতুর পাশে নতুন সেতুর নামকরণ করে গিয়েছিলেন ঋষি বঙ্কিম সেতু। ২০০৯ সালের ৮ই নভেম্বর নৈহাটিতে গিয়ে ওই একই জায়গায় ফের শিলা পুঁতে এলেন মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার ঋষি বঙ্কিম সেতুর জায়গায় নাম হয়ে গেল সম্প্রীতি সেতু। খড়্গপুর ও মেদিনীপুরের মধ্যে কংসাবতী নদীর ওপর সেতু ও ডাবল লাইনের জন্য বামপন্থী সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া, প্রবোধ পাণ্ডা এবং রূপচাঁদ মুর্মুর প্রচেষ্টায় তৎকালীন রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব ৪৫ কোটি টাকার সংস্থান করে দেন। কাজও হয়ে যায় অর্ধেকের ওপর। সেই কাজ চলাকালীন ২০১০ সালে ফের সেই একই কাজের জন্য শিলা পুঁতে আসেন মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কাঁচরাপাড়ার রেলওয়ে ফ্যাক্টরিরও দু'বার শিলান্যাস হয়েছে।